প্রেমেন্দ্র মিত্র

৫-১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মিত্র

পরম স্নেহাস্পদেষু

দাদা

প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা অন্যান্য

কবিতার বই	**কখনো মেঘ**
	সাগর থেকে ফেরা
	সম্রাট
	ফেরারী ফৌজ ইত্যাদি
উপন্যাস	**মৌসুমী**
	প্রতিধ্বনি ফেরে
	অন্য এক নাম
	আগামী কাল ইত্যাদি
গল্প	**স্বনির্বাচিত গল্প**
	অফুরন্ত
	ক্বচিৎ কখনো
	পুতুল ও প্রতিমা ইত্যাদি
প্রবন্ধ	**বর্ব্বর যুগের পর**
	বৃষ্টি এলো
	অসংলগ্ন ইত্যাদি

আলোগুলো অনেক আগে জ্বলে উঠেছে এপারে-ওপারে।

দিনের আলোয় কালাপানির নোনাজলের ঢেউ-এ টোল-খাওয়া রঙ-চটা যে জাহাজটাকে একান্ত ক্লান্ত-রুগ্ন হাঘরের মত দেখাচ্ছিল সেটা হঠাৎ আবছা অন্ধকারের যাদুতে যেন নিরাময় হয়ে গিয়েছে। ওপারের আলোর ফোঁটা-সাজান আকাশ আর নগর-শিখরের পটভূমিকায় তার গোটা চেহারাটার কালচে ছোপ যেন নিরুদ্দেশ গতির প্রতীক।

নদীর জল আর দেখা যাচ্ছে না। দুটো বিরাট গাধাবোট দুপাশে নিয়ে একটা ছোট লঞ্চ হাঁফাতে হাঁফাতে আর্তনাদের মত মাঝে মাঝে ধরা গলার ভোঁ ছেড়ে যেন দুপারের সকলের করুণা ভিক্ষা করে চলেছে।

দূরের হাওড়ার পুলটা যেন স্বপ্নের সেতু, হাওড়া-কলকাতার মত দুটো নোংরা ঘিঞ্জি কুশ্রী এ-যুগের শহর নয়—কল্পনার দুই অজানা পুরী জুড়ে দেবার জন্যে বাহু বাড়িয়েছে।

আশ্চর্য! এ সব কথা এখনও ভাবতে পারছে? পারছে পর পর সাতদিন এই জেটির ধারে বসে বৃথাই অপেক্ষা করার পর!

প্রথম দিন সত্যিই আর ফিরে যাওয়ার ক্ষমতাটুকুও ছিল না। মনে হয়েছিল, পাঁচ বছর আগেকার শোভনা হলে হয়ত সত্যিই ওই জেটির শেষ প্রান্তে গিয়ে জীবনের সমস্ত দায় ওই কালো-শীতল জলের তলায় নামিয়ে দিতে পারত নিঃশব্দে।

কিন্তু পাঁচ বছরে সে-শোভনা আর নেই। আর কিছু না হোক, এই তিন বছর মৃত্যুর সঙ্গে প্রতি মুহূর্তের সংগ্রাম জীবনের মূল্য বুঝতে তাকে শিখিয়েছে। দিয়েছে চরম হতাশাকে উপেক্ষা করবার অনমনীয় সঙ্কল্প।

তাই প্রথম দিনের সেই হতাশ বিহ্বলতাও সে জয় করে ফিরে গিয়েছিল।

তখনও মনে হয়ত ক্ষীণ একটু আশাও ছিল যে, কোন রকম একটা অপ্রত্যাশিত আকস্মিক বাধাতেই অনুপম এসে পৌঁছতে পারে নি।

আজ না হোক কাল সে আসবেই। আর এলে ওই নির্দিষ্ট জায়গায় ছাড়া সে দেখা করতে পারে কোথায়?

আশায় ভর করে পর পর সাতদিন এখানে এসে অপেক্ষা করছে সেই দিন থেকে। দুপুর থেকে সন্ধ্যা পার হয়ে যত রাত পর্যন্ত সম্ভব।

কিন্তু অনুপম আসে নি। একটা চিঠিও লেখে নি। চিঠি সে লিখবে না, অবশ্য বোঝাই উচিত ছিল। ধরবার-ছোঁবার কোন চিহ্ন রাখবার মত আহাম্মক সে নয়।

কিন্তু আহাম্মক না হোক, সে এমন নির্মম নির্বিকার হতে পারে এ কি কল্পনাও করতে পেরেছিল কখনও!

কখনও, মানে সেই পাঁচ বছর আগে প্রথম যখন পরিচয় হয়েছিল, তখন।

তাদের আধাবস্তির গলিটা দিয়ে বেরুবার পথে কাপড়-ধোলাই-এর একটা দোকান।

গলিটা যেমন খোলা আর টিনের চাল ফেলে শহরে থেকেও এখনও ভদ্র হয়ে উঠতে পারে নি, সেখানকার মানুষগুলোও তাই। মিস্ত্রি মজুর দোকানের চাকরে উদ্বাস্তুই সব। কিন্তু কলকাতা শহরে তাদেরও ভব্য হবার দরকার হয়। তাই খোলার চালের কাপড়-ধোলাই-এর দোকান চলে।

সেই দোকানের দিকে দুবেলা যেতে-আসতে চোখ দুটো বুঝি আপনা থেকেই যেত।

কিন্তু এ সব কথা কি ভাবছে?

নদীর ধারের বেঞ্চিটা থেকে শোভনা উঠে পড়ল। সত্যিই বেশ রাত হয়েছে। এতক্ষণ এখানে বসে থাকাও নিরাপদ নয়।

কথাটা মনে করে হাসিও পায়। নিরাপদ কথাটার মানে তার কাছে এখনও আছে।

একলা অল্প-বয়সী একটি মেয়েকে একটি বেঞ্চিতে বসে থাকতে দেখে কৌতূহলী কেউ যে হয় নি তা নয়।

সাহস যাদের কম তারা দুচারবার ঘুরে ঘুরে গেছে সামনে দিয়ে।

দু একজন সাহস করে এসে বসেছে বেঞ্চিটার আরেক ধারে।

সবাইকার উদ্দেশ্য হয়ত খারাপও নয়। বসবার জায়গা এদিকটায় বড় কম। একটি মেয়ে একটা গোটা বেঞ্চি দখল করে থাকলে অন্যায় হয়। তা ছাড়া মেয়েদের সে দুস্তর দূরত্ব এ যুগই ঘুচিয়ে দিয়েছে ট্রাম-বাসের নিরুপায় ঘনিষ্ঠতায়।

এ সব কথা তখন অবশ্য ভাবে নি। বেঞ্চির ওধারে কেউ এসে বসবার পর উঠে পড়ে কাছাকাছি কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়িয়েছে। তার পর আবার বেঞ্চি খালি হলে এসে বসেছে।

বসেছে কোন আশা না নিয়েই। এ যেন অনুপমকেই একবার শেষ সুযোগ দেওয়া তার কথা রাখবার। সে যে অমানুষ হয়ে যায় নি তা প্রমাণ করবার।

অনুপম আর আসবে না। জীবনে হয়ত আর তার সঙ্গে দেখাও হবে না, শোভনা মনে মনে নিশ্চিন্ত ভাবেই এখন জেনে নিয়েছে।

কিন্তু আজ পা দুটো ভারী লাগছে না বেঞ্চি থেকে উঠে প্রায় নির্জন-হয়ে-আসা ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের ধার দিয়ে হাঁটতে।

হতাশার সীমা ছাড়িয়ে একটা কেমন নির্লিপ্ত শূন্যতায় সে গিয়ে পৌঁছেছে। যেখানে চেতনা শুধু বর্তমান মুহূর্ততেই সীমাবদ্ধ।

প্রত্যেকবার পা ফেলার সঙ্গে একটা জুতোর ষ্ট্র্যাপ যে প্রায় ছেঁড়বার উপক্রম তা টের পাচ্ছে। ডান পা-টা একটু টেনে চলতে হচ্ছে তাই।

হাইকোর্টের কাছে এসে ট্রামে উঠবার সময় ষ্ট্র্যাপটা ছিঁড়েই গেল।

ট্রামটা এখানে একেবারে খালি। জুতোটা মাটি থেকে তুলেই নিলে অসঙ্কোচে। লোকজন থাকলে কি সঙ্কোচ হত? বোধ হয় না। এ সব সঙ্কোচ সত্যিই চলে গেছে অনেক দিন। শুধু সঙ্কোচ যে হয় সেই স্মৃতিটুকু আছে।

ডালহাউসী স্কোয়ার পর্যন্ত ট্রামটা প্রায় খালিই গেল।

সেকেণ্ড ক্লাশের ট্রামেই উঠেছে।

ভাড়া দিতে গিয়ে দেখা গেল একটা নূতন পয়সা কম হচ্ছে। হিসেব মত কম হবার কথা নয় মনে হল। সস্তা ছোট চামড়ার ব্যাগটার কোণে কোথাও হয়ত আটকে থাকতে পারে ভেবে বার বার সেটা খুঁজে দেখলে। তার পর বাধ্য হয়েই পাঁচ টাকার নোটটা বাড়িয়ে দিতে হল কণ্ডাক্টারের হাতে।

কণ্ডাক্টার এতক্ষণ বিদ্রূপের হাসি নিয়েই ব্যাগ-খোঁজা দেখছিল, এবার অপ্রসন্ন মুখেই বললে, পাঁচ টাকার ভাঙানি হবে না। খুচরো দিন।

পাঁচ টাকার নোট দেওয়া যে ভাড়া ফাঁকি দেওয়ার ফিকির, কণ্ডাক্টারের রূঢ় স্বরে তার স্পষ্ট ইঙ্গিত।

এই নোট ছাড়া খুচরো আমার কাছে নেই।—শোভনা কণ্ডাক্টারের মুখের দিকে তাকাল। সে দৃষ্টিতে বা স্বরে কাতরতা থাকলে, বিশ্বাস করুক না করুক, কণ্ডাক্টার হয়ত অত কর্তব্যপরায়ণ হত না। কিন্তু শোভনার চোখে বা গলায় স্পর্ধাও যেমন নেই তেমনি দয়াভিক্ষাও নয়।

তা হলে নেমে যেতে হবে।—কণ্ডাক্টার নিজের কর্তব্যই করল নির্বিকার ভাবে।

পাঁচ টাকার ভাঙানি আপনি দিতে পারেন না!—প্রশ্ন নয়, শুধু একটু তিক্ত বিস্ময় শোভনার গলার স্বরে।

না।—কণ্ডাক্টার অবজ্ঞাভরে বলে অন্য যাত্রীর কাছে চলে গেল।

ডালহাউসী স্কোয়ারে এসে তখন ট্রাম থেমেছে।

শোভনা নীরবে নেমে গেল।

রাত কম হয় নি। অফিসের ছুটি হয়ে গেছে অনেক আগে। তবু ডালহাউসী স্কোয়ার একেবারেই নির্জন নয়।

ট্রাম থেকে নেমে দীঘিটার পাড়ের কাছে শোভনা এগিয়ে গেল। এ ট্রাম থেকে নামতেই যখন হয়েছে তখন এইখানে একটু অপেক্ষা করবে। গঙ্গার ধারের চেয়ে এ জায়গাটায় অন্ততঃ নির্ভাবনায় অনেক বেশীক্ষণ থাকা যায়।

বাসায় অবশ্য তাকে ফিরতেই হবে। পাঁচ টাকার নোটের ভাঙানি তার জন্যে দরকার। কিন্তু সে ভাবনা এখন নাই ভাবল।

মনের শূন্য অসাড়তাতেও কণ্ডাক্টারের অহেতুক অপমানটা একটু বুঝি লেগেছে।

কিন্তু সেই সঙ্গে মনে হয়েছে, আজকের দিনের সুরের সঙ্গে এই অপমানটুকুও যেন মেলান। ট্রাম থেকে লাঞ্ছিত হয়ে নামতে বাধ্য হওয়ার মধ্যে যেন তার জীবনের কি একটা রূপক রয়েছে, যা সে ধরতে পারছে না।

পারছে নাই বা কেন? অনেক স্বপ্ন আশা সাধ দিয়ে যে জীবন গড়ে তুলতে চেয়েছিল, বিনা অপরাধে তা থেকে নির্বাসন মেনে নিতেই হবে, এই ত এ রূপকের ইঙ্গিত।

কিন্তু তার পর? নির্বাসন মেনে নিলেই কি সব ফুরিয়ে গেল? না। কিছুতেই নয়। মৃত্যুর কাছে সে হার মানে নি। জীবনের কাছেও মানবে না। শুধু সাধপূরণের বাঁচার চেয়েও বড় কিছু আছে। অন্ততঃ আছে কি না তারই সন্ধান তার মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে-নেওয়া পরমায়ুর অবশিষ্টটুকুকে উদ্বেল করুক।

আজ সে ডালহাউসী স্কোয়ারের গৌরব-হারান দীঘিটার ধারে ছেঁড়া জুতো হাতে আধময়লা পোশাক-পরা নগণ্য একটা মেয়ে।

নগণ্য, কিন্তু নিরর্থক নয়।

এই জটিল দুর্বোধ বহু মানুষের বাসনা কামনা প্রবৃত্তির সংস্পর্শে

সংঘাতে মূর্ত ও বিবর্তনশীল মহানগরের একটি প্রাণকেন্দ্রে তার সমস্ত অতীতের বাহুপাশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একলা দাঁড়িয়ে থাকাও একটা রূপক হোক নতুন ভবিষ্যতের। বাঁ দিকে বিরাট্ উজ্জ্বল টেলিফোন-ভবনের আয়তনটায় তারই আশ্বাস ভাবতে ক্ষতি কি?

ভাবতে বাধা নেই। কিন্তু এ ভাবনাও একরকম বিলাস, শোভনা বোঝে।

চরম হতাশা ও অবসাদের শূন্যতাও নেশার মত মনে একটা ঘোর লাগায়। দিগন্তে যা সাজায় তা হয়ত শুধু কল্পনার মরীচিকা ছাড়া কিছু নয়।

শোভনাকে ফিরে আসতে হয় একেবারে নির্মম বাস্তব বর্তমানে। যেখানে পাঁচ টাকার নোট ভাঙিয়ে বাসায় ফিরে যাওয়ার তুচ্ছ ব্যাপারটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা।

এই নোট ছাড়া খুচরো আমার কাছে নেই।—বলেছিল কণ্ডাক্টারকে।

সত্য কথাই বলেছিল কিন্তু তার সঙ্গে উহ্য ছিল অনেক কিছু। সে কথা কণ্ডাক্টার বুঝবে কেমন করে!

এই পাঁচ টাকার নোটটি ছাড়া তার কোন সম্বল আর কোথাও যে নেই সে কথা কাকে বলবে?

চলে যাবার দিন অনুপম উদারভাবে যে কুড়িটা টাকা দিয়ে গিয়েছিল তা এতদিন অতি সাবধানে খরচ করেও এই পাঁচ টাকায় ঠেকেছে।

সাবধান হবার দরকার ছিল না অবশ্য প্রথমে। অনুপম ত এক হপ্তা বাদেই আসবে। এখানকার পাট চুকিয়ে তাকে নিয়ে চলে যাবে।

কোথায় নিয়ে যাবে তা তখন বলে নি। জিজ্ঞেস করলেও বলতে চায় নি। সেই একটু মিষ্টি মিষ্টি লাজুক হাসি হেসেছিল, যে হাসিই একদিন তার কাল হয়েছিল বলা যায়।

বিয়ের পর পাশের বাড়ীর সোনাবৌদি এই নিয়েই একদিন ঠাট্টা করে বলেছিল,—শেষকালে ওই একটা মেনিমুখো বর তুই পছন্দ করলি !

সোনাবৌদির জিভটা ছিল আল্‌গা। মুখে কিছু আটকাত না। মনটা নেহাৎ গঙ্গাজলের মত বলে তার কথায় ফোস্কা পড়ত না কারুর কোথাও। কিন্তু এ ঠাট্টার ভেতরে কিছু সত্য ছিল না এমন নয়।

আধাবস্তি পাড়ার মধ্যে শোভনার একটু আলাদা মূল্য ছিল। যেখানে বাংলা অক্ষর-পরিচয়ও সকলের নেই, সেখানে সে পড়াশুনা-করা মেয়ে। সে পড়াশুনা যে কলেজের দরজার চৌকাঠ পেরোতে না পেরোতেই শেষ হয়েছে তাতে তাদের কিছু আসে যায় না। সুন্দরী না হোক, চেহারাতেও সুশ্রী বলা যায়। সেই মেয়ের ঘরবর একটু অন্য রকম হবে আশা করা সোনাবৌদির মত পাড়াপড়শির পক্ষে অস্বাভাবিক নয়।

কেন অমন পছন্দ তার হয়েছিল শোভনা কি নিজেই বোঝে! ওই লাজুক মেয়েলি হাসিটুকু যে তার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল এ কথা ভাবতেই তার অবাক্ লাগে। মনের হদিস্ কে কবে পেয়েছে ?

কাপড় ধোলাই-এর দোকানেই প্রথম দেখা। ডাইং ক্লিনিং-এ কাপড় কাচাবার মত অবস্থা তাদের নয়। কিন্তু বাধ্য হয়ে সেদিন শাড়ীটা নিয়ে যেতে হয়েছিল। ধুতে দিতে নয়, শুধু ইস্ত্রি করাতে। যে কলেজে কিছু দিন পড়েছিল সেখানকার এক সহপাঠিনীর বিয়ের নিমন্ত্রণ। তাদের তুলনায় বড়লোকের মেয়ে। এই আধাবস্তিতে নিজে এসে সেধে গেছে যাবার জন্যে। সুতরাং না গেলেই নয়।

পোশাকী শাড়ী একটাই। কাজের জন্যে উমেদারী করতে যাবার সময় সেইটেই পরে যায় বাড়ীতে কেচে নিয়ে ইস্ত্রি করে। শাড়ীটা ইস্ত্রি করাই ছিল তোরঙ্গের মধ্যে তোলা। মা যে ইতিমধ্যে

কি খুঁজতে তোরঙ্গ ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন তা জানে না। বার করতে গিয়ে দেখা গেল শাড়ীটা লাট হয়ে গেছে। বাড়িতে বিকেলে সব দিন উনুন ধরান হয় না, কয়লা বাঁচাতে। ইস্ত্রি করবার জন্যে তাই ডাইং ক্লিনিং-এ যেতে বাধ্য হয়েছিল।

দোকানে যে কাজ করে, সে-ছেলেটিকে আগেও হয়ত দেখেছে এ পথে যেতে। এত কাছাকাছি থেকে নয়। লক্ষ্যও তেমন করে নি তাই। লক্ষ্য করার মত কিছু নয় অবশ্য সাধারণের চোখে।

কিন্তু শোভনার কি তখনই মনে কোথাও একটু দুর্বোধ সাড়া জেগেছিল ?

ঠিক মনে পড়ে না।

শাড়ীটা ইস্ত্রি করবার ভাবনাই তখন প্রধান। তাতে অপ্রত্যাশিত বাধা এসেছে।

ছেলেটি সঙ্কুচিত ভাবে একটু হেসে বলেছে, এখন ত ইস্ত্রি হবে না। রেখে গেলে কাল দিতে পারি।

আজ রাত্রে আমার দরকার, কাল নিয়ে কি করব ? অধৈর্যের স্বরে বলেছিল শোভনা। ডাইং ক্লিনিং-এ একটা ইস্ত্রি হয় না !

আবদারটা যে অযৌক্তিক, কথাটা বলেই শোভনার মনে হয়েছিল। বলামাত্র ইস্ত্রি করে দেবার দায় ডাইং ক্লিনিং নেবে কেন ? কিন্তু তখন যুক্তির কথা ভাববার সময় নেই।

ছেলেটি কিন্তু অপরাধীর মতই বলেছিল, এখন লোকজন কেউ নেই কি না !

নেই মানে ? ওই ত পেছনেই আপনাদের সব কাজ হয়, আমি জানি না। শুধু ইস্ত্রি বলে নিতে চান না, তাই বলুন।

বেশ একটু তিক্ত স্বরেই কথাগুলো বলে শাড়ীটা নিয়ে চলে আসার সময় ছেলেটি কুণ্ঠিত মৃদু স্বরে বলেছিল—যাবেন না। দাঁড়ান। শাড়ীটা রেখে যান।

ফিরে দাঁড়িয়ে কাউণ্টারের ওপর শাড়ীটা রাখবার সময় ছেলেটির

মুখের দিকে চেয়ে শোভনার একটু অনুশোচনাই হয়েছিল অকারণে তার ওপর তিক্ত হবার জন্যে। ছেলেটির সত্যি কি দোষ? দোকানের মালিক নিশ্চয় নয়। কর্মচারী মাত্র। খদ্দেরের অন্যায় আবদার রাখতে দোকানের নিয়মভাঙা তার পক্ষে সত্যিই শক্ত। দোকানের নিয়ম আর খদ্দেরের বায়নার মধ্যে পড়ে এমন একটা কাতর অসহায় চেহারা তার মুখের যে দেখলে মায়া হয়।

কিন্তু মায়া করে শাড়ীটা ফিরিয়ে নিয়ে যাবার অবস্থা তার নয়।

এক ঘণ্টার মধ্যে চাই কিন্তু। বলে শোভনা চলে গিয়েছিল।

বাড়ীর কাজকর্ম সেরে নিমন্ত্রণে যাবার জন্যে তৈরী হতে এক ঘণ্টার কিছু বেশীই লেগে গিয়েছিল বোধ হয়।

শাড়ীটা আনবার জন্য বেরুবে, এমন সময় বাইরের সরকারী উঠোনে সোনাবৌদির গলা শুনতে পেয়েছিল, কে গা তুমি? রেতের বেলা গেরস্ত বাড়ি ঢুকে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে আছ?

উঠোনটা যদিও তিনদিকের টিনের ও খোলার চালের ভাগ ভাগ করা ঘরগুলির বাসিন্দাদের এজমালি, তবু অনধিকার প্রবেশের দায়ে অভিযুক্ত লোকটি বোধ হয় ভয়ে ভয়েই স্পষ্ট করে তার কৈফিয়ৎ দিতে পারে নি। কৈফিয়ৎটা অন্ততঃ শোভনা শুনতে পায় নি।

সোনাবৌদির পরের কথায় ব্যাপারটা বোঝা গিয়েছিল।

শাড়ী ইস্ত্রি করতে দিয়েছে! তোমাদের সাজোর দোকানে? কেন, এখানে সব গতরে পোকা পড়েছে না কি? যাও যাও, ভাল মানুষের বাছা। পথ দেখ।

সোনাবৌদি মুখ ছুটিয়ে আরও কিছু বলার আগে শোভনা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আগন্তুককে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিল।

হেসে গিয়ে বলেছিল, মিছিমিছি বকাবকি করছ কেন সোনাবৌদি? আমিই শাড়ী ইস্ত্রি করতে দিয়েছিলাম।

ও মা, তুই দিয়েছিলি!—সোনাবৌদি তখন জল হয়ে গিয়ে উল্টো

সুর ধরে রসিকতা করেছিল—কিছু মনে করো না বাপু! আমি ভেবেছি, শাড়ী দেবার ছুতোয় কে কি মতলবে না জানি ঢুকেছে! পাপ মন ত, রাত বিরেতে উটকো কেউ খামেখা শাড়ী দিতে এলে সন্দ হয়!

ছেলেটি তখন শাড়ীটা শোভনার হাতে তুলে দিয়ে পালাতে পারলে বাঁচে।

তার অকারণ লাঞ্ছনা একটু লাঘব করবার জন্যেই শোভনা বলেছিল, আপনি আবার নিজে আনতে গেলেন কেন? আমি ত এখুনি যাচ্ছিলাম!

ছেলেটি অপরাধীর মত বলেছিল, আজ মানে একটু সকাল সকাল দোকান বন্ধ করতে হল কি না। আপনিও এক ঘণ্টার মধ্যে এলেন না। জরুরী দরকার বলেছিলেন, তাই নিজেই দিয়ে গেলাম।

ছেলেটি যাবার জন্যে ফিরে পা বাড়াতে শোভনা হঠাৎ অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, আচ্ছা, এখানে চিনে এলেন কি করে? আমি ত ঠিকানা দিয়ে আসি নি!

না, মানে এইখানেই থাকেন জানতাম! কোন রকমে কৈফিয়ৎটা দিয়ে ছেলেটি আর দাঁড়ায় নি।

সোনাবৌদি হেসে বলেছিল তার পর, বেশ সাজোধোপাটি পেয়েছিস্ ত, ঠিকানা খুঁজে বাড়ি বয়ে শাড়ী দিয়ে যায় আবার ইস্ত্রির পয়সাও নেয় না!

শোভনার খেয়াল হয়েছিল এতক্ষণে। সত্যি, ইস্ত্রির পয়সা ত দেওয়া হয় নি। ছেলেটি চায়ও নি।

ট্রাম থেকে যখন নামল তখন বেশ রাত হয়েছে।

পাঁচ টাকার নোটের ভাঙানির জন্যে এবার আর কোন অসুবিধা হয় নি। সমস্যাটার অত সহজ সমাধানের কথা গোড়ায় মাথায় আসে

নি। ট্রামে উঠবার আগে ডালহাউসীর কণ্ডাক্টারদের ঘাঁটিতে গিয়েই ভাঙানি পেয়েছিল।

ট্রামেই ভাবতে ভাবতে আসছিল সেদিনের কথাগুলো।

ট্রাম স্টপে মাটিতে পা দিয়েই একেবারে বর্তমানে নামতে হল।

এবার ঘরে ফিরতে হবে। মাত্র দু'মাস আগে যে ঘরে অনুপম হাসপাতাল থেকে এনে তুলেছিল, প্রথম মাসের পর দ্বিতীয় মাস যে ঘরের ভাড়া এখনও দেওয়া হয় নি, যে ঘরে প্রথম তিনদিন এক সঙ্গে থাকবার পরই কাজের ছুতোয় অনুপম দু'চার দিন বাদ দিয়ে দিয়ে আসতে সুরু করেছে। তার পর ওই নির্দিষ্ট জায়গায় দেখা করবার গোপন পরামর্শ করে একেবারেই নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছে। দেখা করবার কথা সাতদিন আগের শনিবারে। অনুপম গিয়েছে তারও এক হপ্তা আগে।

ট্রাম থেকে অনেকখানি হাঁটতে হয়। বড় রাস্তায় বেশ খানিকটা গিয়ে তারপর গলি। সে গলি এঁকেবেঁকে বহু দূর গিয়ে যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে শহরের ক্লান্ত বেগ গাঁয়ের গ্লানির সঙ্গে মিশেছে। নতুন পাকা বাড়ি আছে একটা-আধটা, সেই সঙ্গে কাঁচা নর্দমা, নোংরা ডোবা, টিনের চালের মাটকোঠা, প্রায়-ধ্বসে-পড়া পুরনো হাড়গোড় বেরুন ভিটে।

এমনই একটি পুরনো ভিটের এক কোণের একটি ঘরই পৃথিবীতে এখন তার একমাত্র আশ্রয়।

ডোবাটার ধার দিয়ে সরু কাঁচা রাস্তাটা দিয়ে যেতে বাড়ীওয়ালার নিজের থাকবার দিক্‌টা পেরিয়ে যেতে হয়।

একটু বুঝি নিশ্চিন্ত হল বাড়ীওয়ালার ঘরের দরজাটা বন্ধ দেখে। না, ভয়—বাড়ীওয়ালার তাগাদার নয়। সত্যি কথা বলতে গেলে বৃদ্ধ ভদ্রলোক এ পর্যন্ত একদিন বাড়ীভাড়ার কথা তোলেনও নি, ভয় তাঁর প্রশ্নকে। সে প্রশ্নের পেছনে উদ্বিগ্ন মমতাই হয়ত সত্যি আছে। কিন্তু সেই জন্যেই তা আরও অস্বস্তিকর। আজ সকালেই

বাগানের একটা লাউ নিজে হাতে তার ঘরে নিয়ে এসে বলেছিলেন, এই নাও মা, একেবারে ফুল-কচি লাউ। তুটো হয়েছিল। তা তুটো ত আর আমার লাগে না।

শোভনা বিনা আপত্তিতেই লাউটা নিয়েছিল, আপত্তি করে কোন লাভ নেই সে জানে। বৃদ্ধ ইতিমধ্যে অনেকবার নিজের বাগানের ফলমূল, এটা-সেটা তাকে দিয়ে গেছেন। আপত্তি করলে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়েছেন।

বৃদ্ধ লাউটা দিয়ে চলে যেতে গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে বলেছেন, চিঠিপত্র কিছু পেয়েছ নাকি?

শোভনা মৃতুস্বরে বলেছে, না।

চিঠি দেয় নি? তাহলে আজ, আজ নিশ্চয়ই আসবে। তুমি কিছু ভেবো না মা। চিঠি যখন দেয় নি তখন নিশ্চয়ই আর আসতে দেরী করবে না। কিছু একটা অসুবিধা নিশ্চয় হয়েছে, বুঝেছ কি না—আজকাল মানুষ তো আর মানুষ নয়, কলের চাকায় বাঁধা কল। নিজের ইচ্ছেয় কিছু করবার স্বাধীনতা কি কারুর আছে?

সান্ত্বনা দেবার চেষ্টায় নিজেই যেন অস্থির হয়ে বৃদ্ধ চলে গেছেন। আজ এত রাত্রে দেখা হলে অবস্থাটা অস্বস্তিকরই হত।

পেছন দিকের ভাঙা বারান্দা দিয়ে তালা খুলে নিজের ঘরটায় ঢুকে শোভনা তাড়াতাড়ি দরজায় খিল এঁটে দিলে।

এই একটা অন্ধকার ঘর আর একটা রাত তার নিজের একলার। এত ক্লান্তিতেও ঘুম হয়তো আসবে না, তবু আলো সে জ্বালবে না। পেছনের সব বন্ধন-ছেঁড়া অজানা অনিশ্চিত সম্ভাবনার এক নতুন সকাল তার জীবনে কাল আসছে। একটা বিনিদ্র রাত শুধু মাঝখানে থাক তার জন্যে প্রস্তুতির।

দুই

অন্ধকারেই তক্তপোশটা খুঁজে নিয়ে শোভনা তার ওপর গিয়ে বসল।

বসবার সময় পায়ে লেগে কি একটা ঝনঝন শব্দ করে উলটে গেল। কাঁসার গেলাসটাই হবে। বিকেলে বেরুবার সময় জল খেয়ে মেঝেতেই রেখে বেরিয়ে গেছল তাড়াতাড়িতে।

হাতড়ে গেলাসটা খুঁজে সোজা করে রাখতে গিয়ে মনে পড়ল, খাবার জল ঘরে নেই। যাবার আগে তুলে রাখবার সময় হয় নি। ছেঁড়া ব্লাউসটা সেলাই করে নিতেই দেরী হয়ে গিয়েছিল। ব্লাউস আর নেই তা নয়। কিন্তু ওইটেই পরে যেতে চেয়েছিল। হাসপাতাল থেকে এখানে নিয়ে আসবার দিন অনুপম ক'বার তার দিকে চেয়ে হেসেছিল। তার সেই লাজুক মিষ্টি হাসি।

হাসছ কি? জিজ্ঞাসা করেছিল শোভনা,—ছেঁড়া ব্লাউসটা দেখে?

না, না। কেমন একটু কুণ্ঠিতভাবে বলেছিল অনুপম। ছেঁড়া কোথায়? বেশ ত মানিয়েছে।

আ আমার কপাল! এই পুরনো পচা ব্লাউসটাতেই মানিয়েছে? তাহলে ছেঁড়াখোঁড়া পুরনোতেই আমায় মানায়!—শোভনা হালকা সুর একটু রাখতে চেয়েছিল আলাপে।

কিন্তু একটু হাসা ছাড়া অনুপম আর কিছু বলে নি। কেমন যেন অপ্রস্তুতের মত মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

কথা সে আগেও খুব কমই বলত। কিন্তু এতদিন বাদে মৃত্যুর দ্বার থেকে ফিরে আবার ঘর বাঁধবার প্রথম দিনটায় আর একটু মুখর কি হওয়া যেত না!

হাসপাতাল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ট্রেনে এসে ওঠা, ট্রেনে ক'টা স্টেশন বাদেই শিয়ালদায় এসে নামা ও তার পর বাসে উঠে যতদূর পর্যন্ত যাওয়া যায় গিয়ে রিক্শায় ওঠা পর্যন্ত ক'টা কথাই বা সে বলেছে।

পথ যে ফুরোয় না! কোথায় যাচ্ছি আমরা বল ত? জিজ্ঞেসও করেছিল একবার শোভনা।

প্রথম অনুপম শুধু একটু হেসেছিল।

পেড়াপীড়িতে বলেছিল, দেখ না!

শোভনা আর তার পর কিছু জিজ্ঞাসা করে নি। তা বলে সেদিন ক্ষুণ্ণও হয় নি একটু। অনুপমের স্বভাব সে জেনে মেনে নিয়েছে। ওই চাপা স্বভাবেরও কিছু একটা আকর্ষণ আছে তার কাছে।

আজ বিকেলে বার হবার সময় কিন্তু অনুপমের পছন্দ মনে করেই ওই ছেঁড়া ব্লাউসটা পরবার জন্যে সেলাই করতে বসে নি। বসেছিল কি রকম একটা আহত অভিমান থেকে। তখনই যেন মন থেকে অনুপমের সঙ্গে দেখা হবার আশা সে প্রায় মুছে ফেলেছে। যাবার জন্যে তৈরী হয়েছে শুধু একটা জেদের খাতিরে।

কিন্তু জলের ব্যবস্থা বুঝি না করলে নয়।

সারা রাত কিছু না খেয়েই থাকবার জন্যে প্রস্তুত ছিল। এখন বুঝতে পারে, তেষ্টা কিন্তু অনেক আগে থাকতেই পেয়েছে। নির্জলা উপবাস করবার কোন মানে হয় না। সেরকম আত্মপীড়নের কোন অভিলাষ অন্ততঃ তার নেই।

আলোটা তবু সে জ্বালে না। জানা জায়গা। কলসিটা অন্ধকারেই খুঁজে পায়। সেটা নিয়ে খিল খুলে আবার তাকে বার হতেই হল।

টিউব-ওয়েলটা সামনের দিকে। তার ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা দিয়ে ঘুরে যেতে হয়। বাড়ীওয়ালার বুড়ো বয়সের পাতলা ঘুম। পাম্প করার শব্দে হয়ত জেগে উঠতে পারেন। কিন্তু সে ভয় করা আর চলে না।

বারান্দার ভাঙা ধাপ ক'টা একটু সাবধানে নেমে সে সামনের দিকে টিউব-ওয়েলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

কৃষ্ণপক্ষের বিলম্বিত চাঁদ পুব দিকের ছাদের নারকেল সুপারী

বাগানের ওপর দিয়ে ঘোলাটে লালচে চোখ নিয়ে উঠছে। কেমন একটা রুগ্ন জ্যোৎস্নায় ঝিমঝিম করছে চারিধার। ডোবার ধারে ধারে বুনো কি একটা গাছের ঝোপ। হুরহুরে না কি নাম। হলদে সাদাটে ফুলগুলোর রূপ নেই, শুধু কটু একটা গন্ধ। দিনের বেলা চোখেই পড়ে না, বা মনেই থাকে না। এখন যেন মৃতের মুখের বিকৃত হাসির মত দেখাচ্ছে।

শোভনা পাম্পের হাতলটা ধরে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

এ সব অনুভূতিতে হয়ত তার নিজের মনেরই ছায়া। এই জ্যোৎস্নাই হয়ত অন্য কোন মনের অবস্থায় ভাল লাগত। ভাল লাগত এই আচ্ছন্ন নিস্তব্ধতা অন্ততঃ।

আজ আর অনিশ্চিত আগামী কালের মাঝখানে একটা প্রস্তুতির বিনিদ্র রাত সে চেয়েছিল।

সে প্রস্তুতির মানে কি, ভাল করে নিজের মনেও বোঝে নি নিশ্চয়।

কিন্তু সে প্রস্তুতির মাঝখানে খাবার জল তুলতে জলের পাম্পেও আসতে হয়।

শোভনা কলসিটা নীচে রেখে জল তোলবার জন্যে হাতলটা এবার নাড়তে সুরু করলে।

জল উঠল না। অনেকক্ষণ অব্যবহারে জল নীচে নেমে গেছে। পাম্প কাজ করছে না। এখন ওপর থেকে কিছুটা জল ঢালা দরকার।

কিন্তু এখন জল পাবে কোথায়? তার কলসি ত খালি।

পাম্প করা বন্ধ করতেই বাড়ীওয়ালার ঘরে কাশির শব্দ শোনা গেল। টানা টানা কাশির শব্দ বুড়ো বয়সের হাঁপানির।

বাড়ীওয়ালা তাহলে জেগেছেন। এখুনি হয়ত বেরিয়ে আসবেন।

তা আসুন। শোভনা তাঁর কাছেই জল চাইবে পাম্পে ঢালবার।

কিন্তু বাড়ীওয়ালা বার হল না।

শোভনা খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে পাম্পে ঢালবার জল কোথায় পাওয়া যায় তাই ভাবল।

জল না খেয়েই আজ রাতটা কাটিয়ে দেওয়া যায় অবশ্য। কিন্তু কেমন একটা জেদ চেপে গিয়েছে এখন।

কিংবা শূন্য ক্লান্ত হতাশ মন এমনি একটা ছুতো চায় নিজেকে ভুলে থাকবার।

কিন্তু কোথায় জলের জন্যে যাওয়া যায়? বাড়ীওয়ালার কাছে যেতে চায় না।

সে ছাড়া আর এক ঘর ভাড়াটে আছে মাত্র। বারান্দার একেবারে শেষ প্রান্তের ঘরটায়। এক বৃদ্ধা আর তাঁর ছেলে। বাড়িতে আরও ঘর অনেক ছিল, তবে সেগুলি ভেঙেচুরে কোথাও দেওয়াল কোথাও কড়িকাঠ ধ্বসে পড়ে অব্যবহার্য। বাড়ীওয়ালার সেগুলো সারাবার সঙ্গতি হয়ত নেই কিংবা ইচ্ছে।

ছেলে বলতে ছোকরা কেউ নয়, বেশ বয়স্ক ভদ্রলোক।

ভদ্রলোককে একবার-আধবার দেখেছে মাত্র। আলাপ হয়েছে সামান্য দু'চার বার তাঁর মার সঙ্গে। সে ইচ্ছে করেই ঘনিষ্ঠ হয় নি। ঘনিষ্ঠতা সে এখানে আসার পর সকলের সঙ্গেই এড়িয়ে চলতে চেয়েছে। প্রথম হয়তো নিরুপদ্রবে সংসার পাতবার উৎসাহে, তারপর অনুপমের আসা-যাওয়া অনিয়মিত হতে সুরু করবার পরই অস্বস্তিকর প্রশ্নের ভয়ে।

ভদ্রলোক কি করেন, কখন থাকেন কিছুই জানে না। জানবার সুযোগও নেই। ওঁদের ঘর থেকে আলাদা একটা রাস্তায় বার হওয়া যায়। টিউব-ওয়েলটি ছাড়া দুই ভাড়াটের সংযোগের সুযোগ আর কোথাও নেই।

এত রাত্রে ওঁদের কাছেই যাবে নাকি জল চাইতে? তা ছাড়া উপায় কি?

তাকে যেতে কিন্তু হয় না। কলসিটা রেখে দু'পা বাড়াতেই বাড়িওয়ালা আশুবাবুর ঘরের দরজা খুলে গেল।

কাশতে কাশতে বেরিয়ে এসে আশুবাবু একটু কর্কশ কণ্ঠেই হাঁক দিলেন, কে ওখানে ?

আর চুপ করে থাকা চলে না। সামনে একটু এগিয়ে গিয়ে শোভনা বলল, আমি কাকাবাবু। খাবার জল তুলতে এসেছিলাম।

খাবার জল তুলতে! এত রাত্রে! আশুবাবুর কণ্ঠে বিস্ময় থাকলেও কর্কশতা আর নেই।

আজ তুলতে ভুলে গিয়েছিলাম। শোভনাকে কৈফিয়ৎ দিতে হল।

কিন্তু এখন জল পাবে কি করে ? তোলার তো অনেক হাঙ্গাম। মধু আবার আজই ছুটি নিয়ে গাঁয়ে গিয়েছে।

মধু আশুবাবুর সব কিছু করবার একমাত্র চাকর। বৃদ্ধের কেউ কোথাও আছে বলে শোভনা জানে না। এই পোড়ো বাড়িটি আর ওই চাকরটি নিয়েই তিনি থাকেন।

থাক তাহলে। কাল সকালেই তুলব। শোভনা কলসিটা তুলে নিয়ে নিজের ঘরের দিকে যাবার চেষ্টা করলে।

সে কি কথা! আশুবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, খাবার জল না হলে চলে না কি! কলে না গিয়ে আমাকেও তো ডাকতে পারতে! আমার ঘরে কি জল নেই ? কাশির আর একটা টান না এলে আশুবাবু হয়তো আরও কিছু বলতেন।

শোভনা আর বাক্যব্যয় না করে কলসিটা নিয়ে তাঁর ঘরের দিকেই গেল।

কাশিটা সামলে আশুবাবু আবার ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, এস এস মা! আচ্ছা বোকা মেয়ে তো তুমি!

আশুবাবুর ঘরে এর আগে কখনও ঢোকে নি। ঘরটা প্রকাণ্ড। এককালে এইটেই এ বাড়ির বৈঠকখানা ছিল বোধ হয় ?

জিনিসপত্রে ঠাসা হয়ে সে প্রশস্ত চেহারাটা এখন আর তেমন বোঝা যায় না। সমস্ত কিছু খুঁটিয়ে দেখবার সময় না থাকলেও বোঝা যায়, জীবনের পথের প্রায় সব সঞ্চয় দিয়েই আশুবাবু নিজেকে ঘিরে রাখতে চেয়েছেন। এক নজরেই লোহার সিন্দুক, দেরাজ-আলমারী, পর পর সাজানো তোরঙ্গ, ওপর ওপর চূড়ো করা ভাঙা টেবিল-চেয়ার, গড়গড়া, মায় তক্তপোশের নিচে রাখা পিকদানটা পর্যন্ত চোখে পড়ে। প্রথমটা যেন কোন নিলেমের ঘরে ঢুকেছে মনে হয়। ঘরের কেমন একটা বদ্ধ হাওয়ায় ওষুধ ওষুধ গন্ধেও অস্বস্তি লাগে।

তাড়াতাড়ি এখান থেকে বার হবার জন্যেই শোভনা বললে, ব্যস্ত হবেন না। আমার শুধু এক গ্লাস জল হলেই চলবে।

বিলক্ষণ! এক গ্লাসের জায়গায় দু'গ্লাস নিলে কি আমি ফতুর হয়ে যাব নাকি! তুমি নিজেই গড়িয়ে নাও না মা ওই ঘড়াটা থেকে। আমার আবার রাত্রে হাত-পাগুলো একটু কাঁপে, নইলে আমারই দেওয়া উচিত।

সে কি বলছেন? শোভনা সত্যিই কুণ্ঠিত ভাবে হেসে জল গড়াতে গেল। কোন রকমে জলটা নিয়ে এখন সে বেরিয়ে যাবার জন্যে ব্যাকুল। বৃদ্ধ এখুনি নিশ্চয় অনুপমের কথা তুলবেন।

আশুবাবু কিন্তু সে কথা তুললেন না।

জল গড়ানো যখন প্রায় শেষ হয়েছে তখন হঠাৎ বললেন, জল তো নিয়ে যাচ্ছ। খাওয়া হয়েছে আজ রাত্রে?

এ প্রশ্নের জন্যে প্রস্তুত থাকলে শোভনা অতটা থতমত বোধ হয় খেত না। একটু দেরীই হয়ে গেল তার উত্তরটা দিতে, হ্যাঁ, মানে—আজ আর খাওয়ার দরকার নেই। আচ্ছা, আপনাকে খুব কষ্ট দিলাম।

দাঁড়াও।

শোভনা তখন প্রায় দরজার চৌকাঠ পর্যন্ত পোঁছে গেছে, অপরাধীর মত পালিয়ে যাবার আগ্রহে।

আশুবাবুর গলার স্বরে তাকে থামতে হল।

গলার স্বরটাও আলাদা।

শোনো, ঘরে এসে একটু বোসো। আশুবাবু আবার বললেন শোভনার কানে অনভ্যস্ত গলায়।

শোভনাকে ফিরে এসে দাঁড়াতে হল। আশুবাবু ততক্ষণে একটি চৌকির ওপর রাখা জলের ঢাকনা দেওয়া একটা রেকাবি বার করেছেন। রেকাবিতে কটি সন্দেশ, কটি কাটা ফল।

শোভনার দিকে সেটা বাড়িয়ে দিয়ে আশুবাবু বললেন, যাও, নিয়ে যাও। বেশী কিছু নয়, কিন্তু রাত-পিত্তি পড়াটা বাঁচবে!

এবার শোভনা সত্যিই অভিভূত বিমূঢ়। ধরা গলায় বলবার চেষ্টা করলে, কিন্তু আপনার—

তাকে বাধা দিয়ে আশুবাবু বললেন, না, আমার কোনো অসুবিধা হবে না। রাত্রে ওই একটু মিষ্টিটিষ্টি ছাড়া আর কিছু খাই না। আজ সন্ধ্যের দিকেই টানটা বাড়ায় আর খেতে ইচ্ছে হয় নি। এত রাত্রে খেতেও পারব না। কোন রকম কিন্তু না হয়েই সুতরাং নিয়ে যেতে পারো। ছোঁয়াছুঁয়ির বালাই থাকলেও ভাবনার কিছু নেই। ওগুলো এঁটোটেঁটো নয়, তাছাড়া আমি ব্রাহ্মণ।

শেষ কথাগুলো একটু হেসে বলতে গিয়ে আশুবাবু আবার কাশতে সুরু করলেন মুখ ফিরিয়ে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত এত কথা বলার মধ্যে আশুবাবুরও কি একটা অস্বস্তি যেন লুকোন থাকছে না।

শোভনা এ ঘর থেকে পালিয়ে যাবার জন্যেই ব্যগ্র হয়েছিল। কিন্তু রেকাবিটা হাতে নিয়ে পা দুটো যেন তার অচল হয়ে গেছে মনে হল।

মুখে যা বলতে চেয়েছিল তা আর বলা হল না। শুধু চোখদুটোই তার সজল হয়ে উঠল। কিন্তু শুধু কৃতজ্ঞতায় বুঝি নয়, এই অযাচিত করুণার দান নিতে হওয়ার একটা অসহায় দীনতাতেও।

ঘরে একটি মাত্র হ্যারিকেনের আলো। আলো বেশ উজ্জ্বল হলেও

তাতে বার্ধক্যের ক্ষীণ দৃষ্টিতে তার চোখের জল দেখতে পাওয়ার কথা নয়। দেখতেও আশুবাবু নিশ্চয় পান নি; কিন্তু তাঁর পরের কথায় মনে হল সেটা যেন তিনি কেমন করে অনুমান করে ফেলেছেন।

এবারও তাঁর পক্ষে অস্বাভাবিক স্বরে আশুবাবু বললেন, ভাবছ তোমার মত একটা ভাড়াটে মেয়ের ওপর এত অহেতুক মায়া কেন। তোমার মত আমার একটি মেয়ে ছিল বলতে পারলে বোধ হয় ভালো হত। কিন্তু সে রকম কেউ কখনো আমার ছিল না। তোমার ওপর ঠিক মায়া পড়েছে কি না তাও জানি না। কারণ, ও জিনিসটার সঙ্গে আমার পরিচয়ই নেই। সুতরাং বুড়ো হওয়ার অন্য লক্ষণের মত এটা একটা দুর্বলতাই মনে করে নাও।

আশুবাবুর এ ধরনের কথার প্রাচুর্যের মধ্যে তাঁর পরিচয়টাই যেন বদলে যাচ্ছে। তাঁকে এ কয়দিনে যা জেনেছে, সে মানুষ যেন তিনি আর নন।

রুদ্ধকণ্ঠটা কোনরকমে এতক্ষণে যেন মুক্ত করতে পেরে শোভনা বললে, আপনাকে যা বলা উচিত তা কি করে বলব আমি বুঝতে পারছি না। আমাদের সম্বন্ধে ঠিক খবর কিছুই আপনি জানেন না। জানেন না যে···

জানি। আশুবাবু আবার গম্ভীর স্বরেই বাধা দিলেন, অন্ততঃ সবচেয়ে যা জানা দরকার তা বোধ হয় জানি।

শোভনা সবিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকাল। কি জানেন এ প্রশ্নটা শুধু তার মুখ দিয়ে যেন বেরুতে চাইল না।

আশুবাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন, আজ তুমি কখন ফিরেছ আমি জানি। ইচ্ছে করলে তখনই তোমায় ডাকতে পারতাম। তুমি ফিরলেই ডাকব বলে তৈরী হয়েও ছিলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও পারি নি। ভেবেছিলাম কাল সকালেই তোমায় যা জানাবার জানাব। জানি তুমি ক্লান্ত হয়ে কি মন নিয়ে ফিরেছ। আজ রাতটুকু তাই তোমায় বিশ্রাম করতে দিতে চেয়েছিলাম।

এ সব কি হেঁয়ালি ? না, মনের মধ্যে এ সব কথা কোথায় পৌঁছোবে সে আগে থাকতেই বুঝতে পেরেছে !

আশুবাবু যেন দ্বিধাভরে একটু থেমে তার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, আজ বিকেলে তুমি যখন ছিলে না তখন একটা চিঠি এসেছে।

কি চিঠি, কার তা জিজ্ঞাসা করবার প্রয়োজনও শোভনা অনুভব করলে না।

আশুবাবু বলে চললেন, অন্যায় আমি নিশ্চয় করেছি, বুড়ো বয়সের কৌতূহল দমন করতে পারি নি। চিঠিটা পড়েছি।

শোভনা নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, কোন মন্তব্যই করল না।

আশুবাবু যেন তারই জন্যে অপেক্ষা করলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর বললেন, পোস্টকার্ডে লেখা তোমার নামে চিঠি। নিচে কোন নাম সই নেই। কিন্তু চিঠি যে অনুপমবাবুর সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আশুবাবু বিছানার ওপর বালিশের তলা থেকে পোস্টকার্ডটা বার করে শোভনার হাতে দিলেন। বললেন, এখানেই পড়ে দেখ।

শোভনা পড়বার চেষ্টা করল না। সন্দেশের রেকাবীটা ডান হাতে ধরা ছিল। বাঁ হাতে সেটা বদল করে চিঠিটা নিজের অজ্ঞাতসারেই ডান হাত বাড়িয়ে যে নিয়েছে সেটুকু লক্ষ্য করবার খেয়াল থাকলে সে বোধ হয় নিজেই অবাক্ হত।

কই, পড়লে না ? শোভনাকে নীরবে রেকাবী আর চিঠি নিয়ে ফরে যেতে দেখে আশুবাবু সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন।

থাক। ঘরে গিয়ে পড়ব। শোভনার ভাবলেশহীন যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর।

কিন্তু যার জন্যে এ ঘরে ডাকলাম সেই জল নিতেই তো ভুলে যাচ্ছ ? আশুবাবু কণ্ঠটা সহজ করবার চেষ্টা করলেন।

যেতে গিয়ে শোভনা আবার ফিরে দাঁড়াল। সত্যিই জলের

কলসিটাই তো ফেলে যাচ্ছে! কিন্তু চিঠি, খাবারের রেকাবী, জলের কলসি এক সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যায় কি করে!

জীবন যে কি স্থূল ব্যঙ্গরসিক তা লক্ষ্য করবার মত মনের অবস্থা তার নয়। থাকলে হয়ত বুঝত, যা পরম, যা নিদারুণ, তাতে অবান্তর অকিঞ্চিৎ, উপদ্রব ছিটিয়ে পরিহাস করাতেই জীবনের নির্মম কৌতুক।

আশুবাবুই সমস্যা মেটাতে চাইলেন।

বললেন, চল, কলসিটা আমিই দিয়ে আসছি।

আপত্তি জানিয়ে অনর্থক কথা কাটাকাটি করতে শোভনার ভাল লাগল না। শুধু বললে, না, আপনি বরং এই রেকাবীটা নিন। কলসিটা আমিই নিচ্ছি।

সেই ব্যবস্থাই হল।

আশুবাবু ঘরের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে অন্ধকার দেখে বললেন, তুমি তো আলোও জ্বাল নি দেখছি।

এইবার জ্বালব। আশুবাবুর হাত থেকে রেকাবীটা নিয়ে দরজাটা বন্ধ করার ভঙ্গিতে যেভাবে পাল্লা দুটো ধরে সে দাঁড়াল তার ইঙ্গিত বুঝেই কি না বলা যায় না, আশুবাবু আর সেখানে অপেক্ষা করলেন না। ফিরে যাবার আগে শুধু বলে গেলেন, খাবারটা খেয়ো কিন্তু।

মনের যে কোন অবস্থাতেই যান্ত্রিক কাজগুলো বোধ হয় আপনা থেকে সারা হয়ে যায়।

শোভনা দরজা বন্ধ করে প্রথমে লণ্ঠনটা জ্বালল। তারপর গ্লাসটা একটু ধরে নিয়ে জল গড়িয়ে মেঝের ওপরই রেকাবীটা নিয়ে খেতে বসল।

চিঠিটা তক্তপোশের ধারেই রেখেছে। রাখবার সময় ঠিকানার দিক্‌টাই ওপরে পড়েছে এটাও বোধ হয় ভাগ্যের কৌতুক।

কিন্তু চিঠি পড়বার জন্যে কোন আগ্রহ যেন আর তার নেই। কি আছে ও চিঠিতে তা মনের গভীরে জানে বলেই কি! না-ও যদি

জানে, আশুবাবুর কথায় চিঠিটার আসল মর্ম তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠতে তো বাকী নেই!

অপ্রত্যাশিত যদি কিছু থাকে তার জন্যে ত সমস্ত রাত আছে। না জানলেই বা কি হয়?

শোভনার মনের এই অবস্থায়, হয়ত এই অবস্থার দরুনই অদ্ভুত একটা খেয়াল মাথার মধ্যে খেলে যায়। কি হয় চিঠিটা একেবারেই না পড়ে ফেলে দিলে?

ওই অনিশ্চিত জিজ্ঞাসার চিহ্নটুকুই থাক্ না যে জীবন তার শেষ হয়ে যাচ্ছে তার অন্তে!

অনুপমের শেষ বক্তব্যটুকু অবজ্ঞায় জানতে না চাওয়ার মধ্যে যেন প্রতিশোধের একটা তৃপ্তি আছে।

কিন্তু সত্যিই প্রতিশোধের কোন ইচ্ছে তার মধ্যে তীব্র হয়ে আছে কি? তীব্র না হোক, একেবারে নেই তাও নয়। আশুবাবুর কাছে চিঠির কথাটা শোনবার সময়ই হঠাৎ একটা জ্বালা অন্ততঃ হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করেছিল। সে জ্বালা তার পরই অনেক শান্ত হয়ে গেছে। তার জায়গায় এখন একটা তিক্ত অবসাদের আচ্ছন্নতা।

জোর করে খেতে বসলেও একটার বেশী মিষ্টি শোভনা খেতে পারল না। জলের গ্লাসটা শেষ করে সে তক্তপোশের ওপরই উঠে বসল।

চিঠিটা বাঁ হাতে ধরে একটু নাড়াচাড়াও করলে। ঠিকানার লেখাগুলো গোটা গোটা স্পষ্ট, প্রায় নিখুঁত। অনুপমের হাতের লেখা সত্যিই ভাল।

প্রথম সে লেখা দেখার পর ঠাট্টা করে বলেছিল একদিন, তুমি ছেলেবেলা কত কপিবুক মক্স করেছিলে বল তো?

কেন? অনুপম একটু অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, হাতের লেখা কি খারাপ?

খারাপ বলছি! না হিংসে করছি! এটুকুও বোঝ না! বলে শোভনা হেসেছিল।

সে কবেকার কথা! অনুপম ঠিক যাকে প্রাণোচ্ছল বলে তা যে নয় তা সে তখনই জানে, কিন্তু তার জন্যে অনুপমের মাধুর্য তার কাছে বেড়েছে বই কমে নি। অনুপমের সঙ্কুচিত ঈষৎ অসহায় ভাবটাই তার ভাল লেগেছে।

কবে অনুপমের প্রথম লেখা দেখেছিল?

একটা মেয়েদের স্কুলে কাজ পেয়ে মফস্বলের এক পাড়াগাঁয়ে গিয়ে কিছুদিন থাকবার সময়।

কি লিখেছিল সে ভালো করেই মনে আছে। বেশী কিছু নয়। তার কথাও যেমন সংক্ষিপ্ত, চিঠিও তেমনি।

লিখেছিল, তোমার চিঠির আগে চিঠি দিতে পারি নি, সত্যি কথা বলতে গেলে সাহস পাচ্ছিলাম না। তোমার চিঠি পেয়ে ভরসা পেলাম। তোমার গ্রীষ্মের ছুটির ত আর দেরী নেই। আসার তারিখ জানিও।

ব্যস ওইটুকুই। কিন্তু ওইটুকুই সেদিন কি ঝঙ্কার তুলেছিল মনে। 'আসার আগে জানিও!' ওই কটা অক্ষরের মধ্যেই লাজুক স্বল্পবাক্ মনের সমস্ত ব্যাকুলতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সে কি তখনই তার মনের ভুল?

কিন্তু এ সব কি ভাবছে!

চিঠিটা এরই মধ্যে কখন উল্টে ধরেছে জানে না। কয়েকটা মাত্র লাইন। ইচ্ছে করলে অনায়াসেই পড়ে ফেলা যায়।

কিন্তু শোভনা চোখের সঙ্গে মনটাও ফিরিয়ে নিতে চায়।

কেন এ চিঠি না পড়ে সে ফেলে দিতে পারবে না? এইটেই তার নতুন জীবনের সঙ্কল্পের প্রথম পরীক্ষা মনে করতে দোষ কি!

তিন

'সু,

আমি নিরুপায়। তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না, এই কথাটা দু'জনকেই মেনে নিতে হবে। আমার জন্যে বৃথা অপেক্ষা করো না। খোঁজবারও চেষ্টা করো না।'

হ্যাঁ, চিঠিটা শেষ পর্যন্ত শোভনা পড়ল। না পড়ে পারল না। পড়ল, না পড়ার জেদটাও ছেলেমানুষী অভিমানের নামান্তর মনে হল বলে।

চিঠি ওইটুকুই।

স্বাক্ষর নেই, নেই কোনও ঠিকানা।

যে তিক্ত অবসাদ মনটা আচ্ছন্ন করেছিল, এ চিঠি পড়ার সঙ্গে সেটা আবার একটু নাড়া পেল নাকি?

চিঠিটা পড়েই নির্লিপ্ত ভাবে মন থেকে মুছে দেওয়া গেল কই!

সামান্য সংক্ষিপ্ত চিঠি। যতদূর সম্ভব সহজ করে লেখা। কিন্তু ওই ক'টা ছত্রের মধ্যেই কি নির্বিকার নির্মম আঘাত যে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে, যে লিখেছে সে নিজেও কি তা জানে?

এ চিঠি অনুপম অবশ্য না লিখলেই পারত। লেখাটা তার পক্ষে অস্বাভাবিকই বলা যায়। নিজেকে যে এমন করে অসঙ্কোচে সরিয়ে নিতে পেরেছে কি দরকার ছিল তার এই চিঠিটুকু লিখে সম্পর্কের দাঁড়ি-টানাকে স্পষ্ট করতে যাবার!

চিঠির ভাষায় শোভনার মনের দিক্‌টা সম্বন্ধে কতখানি অবজ্ঞা ভরা ঔদাসীন্য ফুটে উঠেছে তা কি অনুপম নিজেও বোঝে!

দেখা হবে না এই কথাটা মেনে নিতে হবে! হবে কি না হবে তা স্থির করবার অধিকার শুধু অনুপমের!

শোভনার কোন বক্তব্য থাকতে পারে কি না তা গ্রাহ্য করবার নয়।

শেষ দুটো কথাতেই অনুপমের এ চিঠি লেখার উদ্দেশ্য এতক্ষণে যেন বোঝা যায়।

'আমার জন্যে বৃথা অপেক্ষা করো না। খোঁজবারও চেষ্টা করো না।'

খোঁজবার চেষ্টাকেই তাহলে অনুপমের ভয়। যেন চিঠি লিখে বারণ করলেই শোভনা এ আদেশ শিরোধার্য বলে মেনে নেবে-ই।

কিন্তু খোঁজবার চেষ্টা সত্যিই যদি শোভনা করে? ঠিকানা দেওয়া নেই চিঠিতে। কিন্তু যেখান থেকে ফেলা হয়েছে সে পোষ্টাফিসের ছাপ হয়ত পড়াও যেতে পারে। পোষ্টাফিসের ছাপ দেখে কারুর সন্ধান পাওয়া প্রায় অসম্ভব নিশ্চয়ই। নিজের এলাকার বাইরে কোথাও থেকে চিঠি ফেলতেও কোন বাধা নেই।

তবু খোঁজ করবার চেষ্টা করলে কিছুই কি করা যায় না?

শোভনা ত পুলিশে গিয়েও খবর দিতে পারে, দেখতে পারে মন্ত্র পড়ে বিয়ে করার দায়িত্ব শুধু নিরুপায় বলেই এড়িয়ে যাওয়া যায় কি না।

'নিরুপায়!'

শুধু ওই একটা শব্দের মধ্যেই সব দায় থেকে নিষ্কৃতির মন্ত্র যেন লুকোন আছে!

কেন নিরুপায় তা জানবার দরকার নেই? জানবারও দাবী নেই শোভনার?

সব সম্পর্ক ছিঁড়ে ফেলা যার উদ্দেশ্য, তার পক্ষে এ চিঠিটুকু লেখাও ত মারাত্মক ভুল। এই চিঠি নিয়েই কাল সকাল থেকে শোভনা স্ত্রীর অধিকার আদায় করবার চেষ্টা করতে পারে না কি?

পুলিশে গিয়ে নালিশ জানালে হয়ত কিছুই হবে না। কিন্তু হতেও ত পারে!

দেশ ছেড়ে কোথাও অনুপম পালিয়ে যাবে বলে মনে হয় না। নিজের পেট চালাবার জন্যেও কোন না কোন কাজ তাকে করতে

হবে। তার প্রথম হাসপাতালে যাবার সময় অনুপম কোথায় কাজ করত শোভনা জানে। সে কাজ অনুপম ছেড়ে দিয়েছে অবশ্য। কিন্তু কিছু একটা হদিস আগের ঠিকানায় গেলে কি মিলবে না? তা ছাড়া এখনও তার কাছে বিয়ের পরের তোলা তাদের দু'জনের ছবিটা ত আছে। সে ছবির চেহারা অনুপমের এখনও বদলায় নি। ওই ছবি আর এই চিঠি নিয়ে কাল সে সত্যিই যদি কোন থানায় গিয়ে তার অভিযোগ জানায়?

কিছুই কি তাতে হবে না! বাড়িওয়ালা আশুবাবুর সাহায্যও সে ত এ ব্যাপারে পেতে পারে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনুপমকে খুঁজে পাওয়া গেলেও কি হবে?

ভাবতে গেলেই আদালতের একটা অস্পষ্ট ঘোলাটে ছবি ভেসে আসে মনে। প্রথম মফস্বলে স্কুলে পড়াতে যাওয়ার সময় একবার মহকুমা আদালতে যেতে হয়েছিল সাক্ষ্য দিতে। পাড়াগাঁয়ের স্কুল। একটি ছাত্রীর বাবা মেয়ের পরীক্ষায় ফেল করা নিয়ে ঝগড়া করতে এসে রাগের মাথায় অফিসঘরের কাগজপত্র ছিঁড়ে হেড মিস্ট্রেসের গায়েই একটা বাঁধানো খাতা ছুঁড়ে মেরেছিল। সে সময়ে সে-ঘরে উপস্থিত থাকার দরুন শোভনাকেই সাক্ষী হয়ে যেতে হয়েছিল।

আদালতের ছবিটা খুব স্পষ্টভাবে মনে পড়ে না। সেই ভয় ভয় অস্বস্তিকর আড়ষ্ট ভাবটা মনে আছে।

অনুপমকে তেমনি আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে বোধ হয়। আর তাকে তার জবানবন্দী দিতে হবে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে উকিল তাদের বিবাহিত জীবনের গভীর গোপন সব খবর জিজ্ঞাসা করবে, সকলের সামনে তা নির্মম ভাবে চুলচেরা বিশ্লেষণের জন্যে মেলে ধরবে।

শোভনা নিজের মনেই শিউরে উঠল। হাসিও পেল সেই সঙ্গে। নিজের ওপরেই করুণার হাসি। মনের ভেতর কোথাও একটা

ক্ষোভের জড় এখনও আছে নিশ্চয়। নইলে এসব কথা ভাববে কেন ?

কিন্তু অনুপম কি এখন ভাবছে ? কি আছে তার মনে ?

হাসপাতালে থাকার সময় অনুপমের মনের এই পরিবর্তনের কোন আভাস পেয়েছিল ? ঠিক বুঝতে পারে না। অনুপম বরাবরই কেমন একটু চাপা। ভেতরে যাই থাক বাইরে তার প্রকাশ বড় ক্ষীণ। কিন্তু ভেতরে কিছু তো ছিল ! যা ছিল তা কেমন করে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল ? নিশ্চিহ্ন কি সত্যিই হয়ে গেছে ? তা কি সম্ভব ?

শেষের দিকে হাসপাতালে অনুপমের দেখা করতে আসা অনিয়মিত হয়ে এসেছিল। খারাপ লাগলেও তা নিয়ে অনুপমের সঙ্গে মান-অভিমানের ঝগড়া করে নি শোভনা। নিজেকেই বুঝিয়েছিল কাজকর্ম ফেলে তার কাছে বেশী হাজিরা দেওয়া অনুপমের পক্ষে সহজ নয়। তা ছাড়া ট্রেনে যাতায়াতের ভাড়াটাও ধরতে হয়। কিই বা তার রোজগার যে হপ্তায় তিন দিন ওই ভাড়া অনায়াসে বহন করতে পারে ? শেষ দিকে অবশ্য হপ্তাকে হপ্তাই কেটে গেছে। অনুপম আসতে পারে নি।

রাগ অভিমান করার বদলে শোভনা উদ্বিগ্নই হয়েছে বেশী, অনুপমের কোন অসুখ-বিসুখ বা বিপদ হয়েছে ভেবে।

এই যদি তার মনে ছিল তাহলে অনুপম তো হাসপাতাল থেকে তাকে না নিতে এলেই পারত !

হাসপাতালে তার সঙ্গিনী ক'টি মেয়ের বেলায় ত তাই হয়েছে। সেরে ওঠবার পর কেউ তাদের নিতে আসে নি। হাসপাতাল আর রাখবে না অথচ বাইরে কোথাও যাবার জায়গা নেই। হাসপাতালের লোকেরাই বিপদে পড়েছে এদের নিয়ে। দু'একজনকে হাসপাতালে ছোটখাট কাজ দিয়েছে। কিন্তু সকলকে ত আর কাজ দেওয়া যায় না। নিরাশ্রয় মেয়েরা অকুলপাথারে পড়েছে।

তাদের একজন নিজে থেকেই মরিয়া হয়ে একদিন আশ্রয়হীন সংসারে বেরিয়ে গিয়েছিল। ফিরে এসেছিল মাসকয়েক বাদে। আবার সাংঘাতিক ভাবে অসুখ বাধিয়ে।

আর একজন অমনি বেরিয়ে গিয়ে আর ফেরে নি। মাইল দুয়েক দূরের একটা ঝিলে তার মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল দিনসাতেক বাদে।

অনুপম তাকে কিন্তু অমন ভাবে পরিত্যাগ করে নি তখন।

কেন করে নি?

নিরুপায় বলে সে যাই বোঝাতে চাক, সব উপায় কি এখানে বাসা বাঁধবার পরই তার শেষ হয়ে গেছে!

না, এই বুঝি তার চরিত্রের স্বাভাবিক প্রকাশ, যে চরিত্র গোড়া থেকে বুঝতে পেরেও শোভনা তার মধ্যে সর্বনাশের সঙ্কেত কখনও দেখতে চায় নি। চরিত্রের এই দৃঢ়তার অভাবই বরং কোন দুর্জ্ঞেয় কারণে ভালবেসেছে।

চিঠিটা আবার অন্যমনস্কভাবে তুলে ধরতে প্রথম সম্বোধনটাই যেন নিস্তব্ধ ঘরে গুঞ্জিত হয়ে ওঠে।

'সু'

এই তার আদরের ডাক নাম। এ নাম শোভনাই শিখিয়েছিল অনুপমকে। ঠিক শেখায় নি, কথায় কথায় একদিন ঠাট্টা করে বলেছিল, শোভনা নামটা আমার ভালো লাগে না। কেমন যেন পোষাকী পোষাকী। বিশেষ তোমার মুখে ভালো লাগে না।

অনুপম সেই সুরেই বলতে পারত, সে তাহলে আমার মুখের দোষ। সেই রকম কিছুই শোভনা আশা করেছিল। কিন্তু সে কথা অনুপম বলে নি। কেমন একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলেছিল, কি বলে ডাকব তাহলে?

কেন! আর একটা ভালো নাম ভাবতে পার না? সকৌতুকে অনুপমের দিকে তাকিয়ে শোভনা খুনসুড়ি করে বলেছিল, একটা আদরের নাম বুঝি মাথায় আসে না!

অনুপমের মুখ দেখে মনে হয়েছিল, সে যেন সত্যিই গভীর ভাবে ভাবতে সুরু করেছে।

শোভনা তার মুখের চেহারা দেখে হেসে ফেলে বলেছিল, তুমি বরং একটা অভিধান নিয়ে এসো, খুঁজে পেতে নাম বার করবে।

অভিধান! এবার অনুপমও হেসেছিল, অভিধান দেখে নাম বার করতে হবে!

নইলে তোমার মাথায় ত আসবে না! শোভনা আদরের সুরে বলেছিল, শোন, তোমার অত আর ভাবতে হবে না; আমায় সু বলে ডেকো। তাহলেই আমি খুশী।

সু! অনুপমকে কেমন একটু বিমূঢ় দেখিয়েছিল।

হ্যাঁ, সু। খারাপটা কি? ডাকবার পরিশ্রমটা কমবে তোমার। আর আমিও তোমায় কু বলে ডাকব, কেমন?

এবার তুজনেই হেসেছিল নিজেদের ছেলেমানুষীতে।

কত সামান্য কিছুতেই সেদিন তাদের খুশির জোয়ার উথলে উঠেছে।

এক কামরার সেই ভাড়াটে ঘরে তখন থাকে শহরতলীর এক প্রান্তে। ছোট একতলা বাড়ী। তিনটি মাত্র ঘর। তিনটিতেই আলাদা আলাদা ভাড়াটে। এখানকার মতই এজমালী জলের কল। তবে টিউবওয়েল নয়, সরকারী কল।

সেই একটি ঘর আর তার সামনের বারান্দাটুকু নিয়ে তাদের প্রথম সংসার সুরু। এর চেয়ে ভালো বাসা ভাড়া নেওয়ার সঙ্গতি কোথায়?

কিন্তু একখানা সঙ্কীর্ণ ঘরই তাদের কাছে আনন্দের দিগন্ত ছাড়িয়ে রাখে নি কি?

অভাব অসুবিধেগুলোই আনন্দের উত্তেজনার খোরাক জুগিয়েছে।

কলের জলের ধারা ওই অঞ্চলে অত্যন্ত ক্ষীণ। সকালে বিকালে তুবার কিছুক্ষণের জন্যে এসেই বন্ধ হয়ে যায়। ভোরে উঠে প্রথম কলের

জল ধরবার জন্যে রীতিমত লড়াই করতে হত। কে কত ভোরে উঠে আগে গিয়ে বালতি ধরতে পারে তারই প্রতিযোগিতা। একটু দেরী করলে রান্না-খাওয়ার জল যদি বা জোটে স্নানের জলের আশা নেই।

সেই জল ধরার ব্যাপারেই প্রতিদিন কি উল্লাস উদ্বেগ উত্তেজনা!

কতদিন স্নান না করেই কাটাতে হয়েছে প্রথম প্রথম। তারপর বাড়ীর কলের জল না পেলেও স্নানের সুবিধে করতে পারায় সে কি দিগ্বিজয় করার আনন্দ।

সুবিধে আর কিছু নয়, পাশের বাড়ীর সেই দুখী বৌএর সঙ্গে ভাব।

দুখী বৌ নামটা কে দিয়েছিল মনে নেই। পাশের ঘরের ভাড়াটে বুড়ীর সেই ফাজিল মেয়েটার কাছেই শুনেছিল বোধ হয়।

নামটা হিংসে করেই দেওয়া মনে হয়েছিল প্রথম। দুখী বৌ-এর দুঃখের কিছু আছে বলে মনে হয় নি। তাদের পাড়ার সবচেয়ে বড় সাজানো-গোছানো ছবির মত বাড়ী। আঙুল নাড়লে হুকুম তামিল করবার মত ঝি চাকর দারোয়ান। কখনও কখনও যেতে-আসতে স্বামীটিকেও দেখেছে। থিয়েটার বায়স্কোপেও অমন চেহারা ফেলনা নয়। বৌটি নিজেও সুন্দরী না হোক কুৎসিত বলা যায় না। বিকেলে বারান্দায় কি ছাদে যখন ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়, তখন সাজ-পোশাকে গহনায় অন্ততঃ রাজকন্যে রাজকন্যেই দেখায়।

তাহলে দুঃখী কিসে? স্বামী বদখেয়ালী। তাও শোনে নি কারুর কাছে। নিঃসন্তানও নয় বোধ হয়। একটি ছেলে আছে বলেই তখন শুনেছিল। বাইরে কোথায় নাকি পড়ে।

কিসে দুঃখী, ও বাড়ী থেকে চলে আসবার সময় পর্যন্ত অন্ততঃ জানতে পারে নি। তখন ব্যাপারটা নিয়ে মাথাও ঘামায় নি তেমন। নিজের জগৎ নিয়েই তখন তন্ময়। অন্যের নামের রহস্য ভেদ করবার উৎসাহ কি অবসর তখন নেই।

বৌটির সঙ্গে দুদিন আলাপ-সালাপ হতেই স্নানের জলের সমস্যাটা মিটে যাওয়ায় আনন্দের আর সীমা ছিল না।

জলের কষ্টের কথা কি প্রসঙ্গে শুনে বৌটি নিজেই বলেছিল, দরকার হলে তাদের বাড়ীতে এসে স্নান সেরে যাবার। সে বাড়ীতে জলের অভাব নেই। টিউবওয়েলের ইলেকট্রিক পাম্প করা অঢেল জল। নিচে ওপরে তিন তিনটে স্নানের ঘর। ঝি চাকর বাদে মানুষ বলতে তারা ত মাত্র স্বামী-স্ত্রী দুজন। স্বামীও সেই সকালে বেরিয়ে রাত্রের আগে বাড়ী ফেরেন না। শোভনার সুতরাং কোন সঙ্কোচের কারণই ছিল না।

সঙ্কোচের কারণ না থাক নেহাৎ অসহ্য না হলে শোভনা সে বাড়ীতে স্নান করতে যেত না। যেত না, বড়লোকের অনুগ্রহ নিতে অনিচ্ছার জন্যেই নয়, যেত না জলের দুর্লভতাটুকু ভুলে না যাবার জন্যে। দুখী বৌ-এর প্রশস্ত হালফ্যাশনের স্নানের ঘরের অফুরন্ত জলে স্নান করতে করতেই একদিন তার একথা মনে হয়েছিল। মনে মনে সেই দিনই গভীরভাবে যেন বুঝতে পেরেছিল, অভাব না থাকলে কোন পাওয়াই সত্যিকার পাওয়া হয় না।

সত্যিই অভাব-অনটন ও সেদিন যেন উপভোগ করেছে। দারিদ্র্যের সঙ্গে নির্ভীক সংগ্রামের ভেতর দিয়ে দুজনে আরও যেন কাছাকাছি এসেছে বলে মনে হয়েছে।

অনুপমের মনে সেসব দিনের স্মৃতি কি একেবারেই আর নেই?

'সু' বলে সম্বোধন লেখবার সময়ও কি একবার বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে নি!

না, তা ওঠে নি, সে জানে।

তার নিজের বুকেও এসব স্মৃতি তেমন করে আর মোচড় দেয় কি? মনে হয় না। এসব যেন আর কার অনেকবার পড়া গল্প, নতুন করে প্রতিবার পড়বার সময় যার সাড়া ক্রমশঃই ক্ষীণ হয়ে আসে।

বাইরে কোথায় অনেকগুলো কুকুর একসঙ্গে ক্রমাগত

ডাকছে। এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তের কুকুরের পাল তার ধুয়ো ধরল।

কিছুক্ষণ আর এ উপদ্রব থামবে না। কত রাত হয়েছে কে জানে। শোভনা লণ্ঠনটা নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল। ঘুম না আসুক, একটু বিশ্রাম আর না করলে নয়। সমস্ত শরীর ক্লান্তিতে হতাশায় ভেঙে পড়েছে।

সকালে ঘুম যখন ভাঙল তখন বেশ বেলা হয়েছে। খোলা জানলা দিয়ে কড়া রোদ্দুর মুখে এসে পড়াতেই ঘুমটা ভেঙেছিল। কিন্তু শোভনার ঘুমের মধ্যে মনে হয়েছে কে যেন হঠাৎ রূঢ় কঠিন হাতে তাকে স্পর্শ করে জাগিয়ে দিলে।

তক্তপোশটার উপর উঠে বসতেই কি একটা নিচের মেঝেয় পড়ে গেল। অনুপমের সেই চিঠিটাই।

যাক্। ওটার আজ আর কোন দামই না থাকা উচিত তার কাছে।

তীব্র রোদের আলো নয়, জীবনই তাকে রূঢ় স্পর্শে আজ জাগিয়ে দিয়েছে মনে করতে পারে।

উঠে গিয়ে দরজাটা খুলতে চোখটা প্রথম একটু ধাঁধিয়ে গেল। জানলা দিয়ে রোদের একটি তীক্ষ্ণ রেখাই এসেছিল। এ একেবারে আলোর প্লাবন। খুব গভীর ভাবে ঘুমিয়েছে নিশ্চয়। শরীরটা বেশ স্বচ্ছন্দ মনে হচ্ছে। সেই সঙ্গে মনটাও নয় কি! সমস্ত গ্লানি অবসাদ যেন কেটে গেছে এক রাত্রেই।

ওদিকের বারান্দা ঘুরে আশুবাবু আসছেন। তার কাছেই নিশ্চয়। হাতে বাগানের ক'টা আনাজ।

শোভনা ভেবেছিল, তাকে বুঝি তার কিছু দিতে এসেছেন। কিন্তু দেখা গেল তা নয়। কাছে এসে দাঁড়িয়ে আশুবাবু বললেন, আগে একবার এসেছিলাম। ঘুমোচ্ছিলে বলে আর ডাকি নি।

শোভনা চুপ করে রইল। বোঝাই যাচ্ছে আশুবাবু অন্য কিছু একটা বলবার ভূমিকা করছেন। কথাটা কালকের প্রসঙ্গ নিয়ে হওয়াটাকেই তার ভয়। সে প্রসঙ্গ আজ এই উদার আলোর সকালবেলায় সে মনেও আনতে চায় না। আকাশের মত মনটাকে একটা বেলা অন্ততঃ নির্মল রাখতে চায়।

আশুবাবু সে প্রসঙ্গ তুললেন না। যা বললেন তা একেবারে অপ্রত্যাশিত না হলেও কিছুটা অভিভূত করবার মত।

বললেন, মধু ত আজও আসবে না। তুমি আজকের রান্না-বান্নাটা যদি আমার করে দাও!

সহজ স্বাভাবিক কণ্ঠ। অনুনয়ের মিথ্যে ভান নেই, অনুগ্রহের সুরও না।

আশুবাবু তার উত্তরের জন্যে অপেক্ষা পর্যন্ত করলেন না, এইটুকুর জন্যেই বুঝি শোভনা সবচেয়ে কৃতজ্ঞ।

দরজা ধরে শোভনা কতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল তার মনে নেই।

কি ভাবছিল, সে নিজেই ভাল করে বলতে পারবে না। ভাবছিল খানিকটা বোধ হয় এই যে, সংসার অকারণে হয় নিষ্ঠুর নয় অহেতুক দয়ালু। দুই রূপই তার সমান অস্বস্তিকর কি না তাই বোধ হয় বুঝতে চেষ্টা করছিল মনের মধ্যে তলিয়ে।

নমস্কার! শুনে তার চমক ভাঙল।

ওদিকের ঘরে যে ভদ্রলোক বৃদ্ধা মাকে নিয়ে থাকেন তিনিই সামনের উঠোনে দাঁড়িয়ে।

ভদ্রলোককে এর আগে দু'একবার দেখেছে মাত্র। আলাপ হয় নি।

আজ তিনি নিজেই এগিয়ে এসে বললেন, আমি ওই ওদিকের ঘরে থাকি, জানেন বোধ হয়?

শোভনা মাথা নেড়ে যথাবিহিত একটু হাসবার চেষ্টা করলে।

ভদ্রলোক নিজেই পরিচয় দিলেন—আমার নাম নিখিল, নিখিল । প্রতিবেশী হিসেবে আগেই অবশ্য আলাপ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এতদিন প্রায় প্যাঁচা হয়ে ছিলাম কি না? রাত-জাগার কাজ সেরে দিনের বেলা এসে বিছানা ছাড়া আর কারুর সঙ্গে আলাপের সময় পাই নি।

নিখিলবাবু একতরফা কথার তোড় একটু থামিয়ে তাঁর আপাদ-মস্তক একবার চোখ বুলিয়ে হঠাৎ হেসে বললেন, প্রতিবেশী হবার দাবিতে আপনার ওপর একটু অত্যাচার করতে এলাম।

চার

শোভনা কিছু বললে না। শুধু তার মুখের লৌকিকতার হাসিটা ইচ্ছে করেই মুছে দিলে।

নিখিল বক্সীর চোখে তা না পড়বারই কথা। পড়লেও তার গলার স্বর কি বলার ভঙ্গি বদলাল না।

নামটা জানিয়েই যেন সে অন্তরঙ্গতার দাবী পাকা করে ফেলেছে এমনি অসঙ্কোচে নিখিল তখন বলে চলেছে—আমার মাকে ত দেখেছেন। বয়স কত বলতে পারেন?

অত্যাচার করবার আবদার থেকে মার বয়স কত জিজ্ঞাসার এই অসংলগ্ন প্রলাপে শোভনার মুখে একটু বুঝি ভ্রূকুটি ফুটে উঠেছিল। সেটা এবার নিখিল বক্সীর দৃষ্টি এড়াল না।

হেসে বললে, কি আবোলতাবোল বকছি ভাবছেন ত? আসলে এটা হচ্ছে ভূমিকা, বুঝছেন। অত্যাচারটা কি রকম তা বোঝাতে হবে ত? শুনুন, মার আমার বয়স ষাট। আমি হলাম অষ্টম গর্ভের সন্তান···

হঠাৎ শোভনার মুখের চেহারা লক্ষ্য করেই বোধ হয় বক্তৃতা মাঝ-

পথে থামিয়ে গম্ভীর হয়ে নিখিল বললে, থাক্ ভূমিকা। আপনার ছুঁচসুতো আছে ?

শুধু নিখিল বক্সীর বলার ভঙ্গিতেই নয়, অতখানি ভণিতার পর এই অপ্রত্যাশিত পরিণতিতেও শোভনা হেসে ফেললে।

তার পর কৌতুক-প্রসন্ন মুখে না বলে পারলে না,—আছে। কিন্তু ছুঁচসুতোর সঙ্গে আপনার মার বয়সের কি সম্পর্ক ?

বুঝতে পারলেন না ? নিখিল আবার উৎসাহিত হয়ে বলে উঠল, মাকে এই গুণধর ছেলের জন্যে কি করতে হয় দেখেছেন ত ? অষ্টম গর্ভের সন্তান হয়ে—আর কিছু না পারি একটা কীর্তি রেখে যাচ্ছি। বুড়ী মাকে এমন দাসী বাঁদীর মত খাটাতে আর কোন স্বনামধন্য পুরুষ পেরেছেন বলে ইতিহাসে জানা নেই। কিন্তু মুশকিল হয়েছে একটা। চাকরানী থেকে রাঁধুনীগিরি মা মরে মরে হাতড়ে হাতড়ে সব করেন, শুধু চোখ দুটো একেবারে গিয়ে ওই সেলাইয়ের কাজটা ওঁকে দিয়ে আর হয় না। আমার আবার এমন বেয়াড়া সখ যে জামায় কাপড়ে সেলাই না হলে পরতে ভালো লাগে না।…

ভদ্রলোকের কথার স্রোত আবার এমন প্রবল হয়ে উঠবে জানলে শোভনা অসতর্ক হয়ে ওই সামান্য কৌতুকটুকু নিশ্চয় প্রকাশ করত না। এখন নিজের ভুল শোধরাতে তাড়াতাড়ি কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললে, আপনি দাঁড়ান, আমি ছুঁচসুতো এনে দিচ্ছি।

ঘরের ভেতর গিয়ে ছুঁচসুতো যে ছোট টিনের বাক্সে থাকে সেটা খুঁজতে একটু দেরী হল। এ ক'দিন ঘর সংসারের কোন কিছুতে মনই দিতে পারে নি। জিনিসপত্র সব অগোছালো হয়েই আছে।

ছুঁচসুতোর বাক্সটা শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেয়ে বাইরে এসে দাঁড়াবার পর শোভনা কিন্তু অবাক্।

নিখিল বক্সী সেখানে নেই।

ভদ্রলোক গেল কোথায় ?

এমনিতেই ভদ্রলোকের কথাবার্তা, ধরনধারণ অদ্ভুত লেগেছিল, এখন যেন তার মধ্যে পাগলামির লক্ষণ আছে বলে সন্দেহ হল।

পাগলামি যদি না হয় তা হলে অত ভণিতা করে ছুঁচসুতো চাওয়ার পর তা না নিয়েই চলে যাওয়া কি ধরনের রসিকতা ?

জানা নেই শোনা নেই অপরিচিতা একজন ভদ্রমহিলার সঙ্গে এরকম রসিকতা নেহাৎ বর্বর ছাড়া কেউ করতে পারে !

শোভনার একবার মনে হল ছুঁচসুতোর বাক্সটা নিয়ে সোজা নিখিল বক্সীদের ঘরেই গিয়ে চড়াও হয়। গিয়ে স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করে, এ অভদ্র রসিকতার মানে কি ?

কিন্তু সকালের যে প্রসন্নতা ইতিমধ্যেই খানিকটা অকারণে নষ্ট হয়েছে তা আর সে সম্পূর্ণভাবে হারাতে চায় না।

বাক্সটা নিয়ে ঘরের দিকে ফিরতে না ফিরতেই কিন্তু নিখিল বক্সী আবার এসে হাজির। মুখে তার সকৌতুক হাসি, হাতে একটি জামা।

আকস্মিক অন্তর্ধানের কৈফিয়ৎটা প্রথমেই সে দিয়ে নিলে, এই জামাটা আনতে গেছলাম। দুটো হাতা ধরে সেটা টান করে তুলে নিখিল তারপর বললে, ছেঁড়া দেখতে পাচ্ছেন ?

শোভনা জবাব দিল না। কিন্তু তার মৌন গাম্ভীর্যেও নিখিল এখন আর দমবার নয়। হেসে বললে, পেলেন না ত ? আমাদের মত ভাগ্যবানদের জামা কোথায় ছেঁড়ে জানেন ? পকেট দুটোয়। পকেট গড়ের মাঠ হলে কি হয়, ওইটের উপরই নিয়তির প্রথম টান। আর ছেঁড়া পকেট সেলাই করা যে কি শক্ত !

এই নিন ছুঁচসুতো। শোভনা বাক্সটা খুলে নিখিলের দিকে বাড়িয়ে ধরল। তার মুখ যেমন গম্ভীর তেমনি গলার স্বর।

আমি নেব ! নিখিল যেন হতভম্ব, আমি নিয়ে কি করব !

কি করবেন তা আমি কি করে জানব ! আপনি ত ছুঁচসুতোই চাইলেন। শোভনার গলায় বিরক্তিরই আভাস।

কিন্তু নিখিল যেন তাতে নির্বিকার, হ্যাঁ চাইলাম, কিন্তু সে কি

নিজে সেলাই করব বলে! ওই ছেঁড়া পকেট সেলাই করা আমার কর্ম!

শোভনার অবিবেচনায় নিখিলই যেন ক্ষুণ্ণ।

বলার ভঙ্গিতে অস্বস্তি বিরক্তির মধ্যেই শোভনার হাসি পেল। গলাটা তবু একটু কঠিন রেখেই বললে, সেলাইটা কি আমায় করতে হবে বলছেন?

তা ছাড়া কি! নিখিল অকুণ্ঠিত,—একটু অন্যায় আব্দার হচ্ছে মনে করতে পারেন, কিন্তু সেই সঙ্গে একটু ক্ষমাঘেন্না করে নেবেন এই বুঝে যে, বুড়ী মাকেই যে খাটিয়ে খাটিয়ে হাড় কালি করে দিতে পারে তার বিচার-বিবেচনা আর কত হবে!

আচ্ছা, জামাটা তাহলে রেখে যান। বিকেলে নেবেন।

কথা আর না বাড়াতে দেবার জন্যে জামাটা একরকম নিজেই টেনে নিয়ে শোভনা ঘরের ভেতর গিয়ে ঢুকে ইচ্ছে করেই দরজাটা আবার ভেজিয়ে দিলে।

ছেলেবেলা মার সঙ্গে অনেকবার যাত্রা দেখতে যাবার কথা মনে আছে শোভনার।

জনা, সুরথ উদ্ধার, এমন একটা দুটো পালার নামও ভোলে নি এখনো। অত্যন্ত করুণ পালা। মনে আছে মা সারাক্ষণ যাত্রা দেখতে দেখতে কেঁদে ভাসাতেন। কিন্তু সেই করুণ পালার মাঝখানেও হঠাৎ আচমকা দু' একজন ভাঁড় এসে খানিকক্ষণ হাসিয়ে লুটোপুটি খাইয়ে যেত। অবান্তর অর্থহীন হাসি। কিন্তু ভালো লাগত।

সকালে নিখিল বক্সীর ব্যাপারটাও তেমনি তার জীবনে একান্ত অবান্তর অসংলগ্ন হলেও খুব খারাপ লাগে না ভাবতে।

সকালে শোভনা আশুবাবুর জন্যে রান্না করেছে। খেয়েছেও

অবশ্য সেখানেই। আশুবাবু তাঁর সঙ্গেই বসতে বলেছিলেন। শোভনা সে কথা শোনে নি। তাঁকে খাইয়ে তারপর বসেছে খেতে।

অস্বস্তি লেগেছে একটু, আশুবাবু নিজে এসে বসে থাকার দরুন। আশুবাবু অবশ্য খাওয়ান নিয়ে বাড়াবাড়ি কিছু করেন নি। বাড়াবাড়ি করা তাঁর যে স্বভাব নয় এটুকু অন্ততঃ এখানে আসার পর সামান্য পরিচয় যা হয়েছে তাতেই বুঝেছে। আশুবাবু তাকে যতটা সম্ভব সহজ হতে দেবার জন্যেই বসে থেকেছেন মনে হয়েছে। তাকে ঠিক রাঁধুনী হিসেবে নেবার অনুগ্রহ যে এটা নয় তা বোঝানোও তাঁর কতকটা উদ্দেশ্য বোধ হয়। বেশী কথা তিনি বলেন নি। সামান্য দু' চারটে কথা যা বলেছেন তাতে একটা ইঙ্গিত কিন্তু স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শোভনাকে রান্নার ভার দেওয়ার এই ব্যবস্থাটা দু' এক দিনের সাময়িক ব্যাপার নয়, আশুবাবু এটা পাকা বলেই ধরে নিতে চান।

এক সময়ে অবান্তর ভাবেই ঘুরিয়ে কথাটা বলেছেন, রান্না তোমার ভালো মা, কিন্তু আজ যেমন নেমন্তন্ন খাওয়ালে তা রোজ রোজ খাওয়ালে এ মরা পেটে সইবে না। হিতে বিপরীত হয়ে দুদিনেই টেঁসে যাব।

নেহাৎ কথার উত্তর দেওয়া দরকার বলেই শোভনা বলেছে, আজ এমন কিছু ত রাঁধি নি!

মধুর হোটেলে খেয়ে যার দিন কাটে এই রান্নাই তার কাছে ভুরিভোজ! আশুবাবু একটু হেসে বলেছেন, আর একটু হাতটান করতে হবে, বুঝেছ?

আর একবার অমনি অকারণে বলেছেন, মধুর রান্নার ভয়ে আমিষ ত ছেড়েই দিয়েছি কতকাল। স্বাদই ভুলে গেছি বলতে গেলে।

আপনি কি মাছ-মাংস খান? আশুবাবুর ঘরে রান্নার যা সাজ-সরঞ্জাম দেখেছে, তাই থেকেই একটু অবাক্ হয়ে শোভনা প্রশ্ন করেছে।

খাব না কেন? আমি কি সন্ন্যাসী! তুমি রেঁধেই দেখো না। বলে আশুবাবু খাওয়ার শেষের দিকে হঠাৎ উঠে গেছেন।

শোভনা কৃতজ্ঞ হয়েছে সন্দেহ নেই। বর্তমানের সবচেয়ে কঠিন সমস্যার এমন সহজ মীমাংসা সে কল্পনা করতেও পারে নি। ভাগ্যের নির্মম আঘাতের সঙ্গে এই অপ্রত্যাশিত করুণাটুকু যেন অযৌক্তিক ভাবে মেশানো।

আশুবাবুর কথায়-বার্তায় ও ধরন-ধারণে বোঝা গেছে যে খাওয়া-থাকার ভাবনাটা এখনকার মত অন্ততঃ সে ভুলেই থাকতে পারে। মাত্র পাঁচ টাকা যার সংসারে সম্বল তার পক্ষে এটা কম কথা নয়।

কিন্তু এই মীমাংসাই কি যথেষ্ট?

আশুবাবু তাঁর অনুগ্রহ বুঝতে দিতে চান না একথা ঠিক। তাঁর নিজের প্রয়োজনের অজুহাত দিয়ে তিনি এ অহেতুক দয়া ঢেকে রাখতে ত্রুটি করবেন না, কিন্তু তবু শোভনা নিশ্চিন্তভাবে পরিতৃপ্ত হতে পারছে না কেন?

কেন মনে হচ্ছে ভাগ্যের এই অপ্রত্যাশিত করুণার মধ্যে একটা তীক্ষ্ণ পরিহাসই প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। তার ভাঙা নৌকো অকূল সমুদ্রে ভাসিয়েও ভাগ্য যেন কাছির দড়ি দিয়ে তীরের সঙ্গে বেঁধে রেখেছে। জীবনের এত বড় কঠিন পরীক্ষার এমন সহজ সমাধান মেনে নিলে তার সত্তাকেই যেন অসম্মান করা হয়।

নিখিল বক্সীর জামাটা দুপুরে ঘরে বসে সেলাই করতে করতে শোভনা এলোমেলো ভাবে এই সব কথাই ভাবছিল।

নিখিল বক্সীর কথাটা মনে পড়লে এখন একটু কৌতুক বোধই হয়।

কিন্তু মানুষটা সত্যিই শুধু হাস্যাস্পদ কি?

কথার বাঁধুনি নেই, ধরন-ধারণ সপ্রতিভ হওয়া সত্ত্বেও অদ্ভুত, কিন্তু সবসুদ্ধ জড়িয়ে কোথায় যেন কি একটা দুর্বোধ কিছু আছে।

চেহারাটাই কেমন খাপছাড়া। রোগাটে দীর্ঘ দেহ কিন্তু দুর্বল

বলে মনে হয় না। মুখখানা চোয়ালের হাড়-ওঠা লম্বাটে। খোঁচা খোঁচা দাড়িতে তার শ্রী বাড়ে নি। তবু মানুষটার ভাঁড়ামীর ধরন ও বেয়াড়াপনা সত্ত্বেও তেমন বিরক্ত হয়ে যেন থাকা যায় না। বরং একটু সহানুভূতিই জাগে।

সেটা কি অবস্থার মিলের জন্যেই ?

ভদ্রলোকের আর্থিক অবস্থা তার মত না হোক বিশেষ যে ভাল তা মনে হয় না। কথায় কথায় কি একটা রাত্রের কাজের কথা যেন বলেছিলেন। সে কাজটাও গেছে বলেই মনে হল। মার কথা থেকে থেকে তোলার মধ্যে কোথায় যেন একটা আত্মগ্লানিই আছে।

ওই কয়েক মুহূর্তের চেনা মানুষটার সম্বন্ধে এত কথা ভাবছে দেখে শোভনা নিজেই হঠাৎ অবাক্ হয়।

না, মানুষটা সম্বন্ধে সত্যিই এমন কোন কৌতূহল তার ত নেই। এ বোধ হয় শূন্য মনের একটা বিলাস। কিংবা মনটা শূন্য রাখবার জন্যেই নিজের অজ্ঞাতে একটা চেষ্টা।

সকালের সে প্রসন্নতা অনেক আগেই কেটে গেছে বটে কিন্তু সমস্ত ভাবনা স্বাভাবিক ভাবে যেদিকে গড়িয়ে যেতে চায় সেদিকে সে যেতে দেবে না।

সকালের প্রসন্নতা আসলে শারীরিক, সে বোঝে। কিন্তু শারীরিক প্রসন্নতার দামই বা কম কি !

তাইতে সন্তুষ্ট থাকতে পারলে ত জীবনের বেশীর ভাগ সমস্যা মিটে যায়।

কোথায় কার লেখায় পশুদের প্রশান্তির কথা যেন পড়েছিল। কোন কবিতাতেই বোধ হয়। পশুদের মনের বালাই নেই বললেই হয়। কিন্তু তাতে এমন কি লোকসান ?

মানুষ মনের রাজ্যে পৌঁছে খুব বেশী জিতেছে কি ? মনের বায়না মেটাবার ঝামেলা পোহাতেই ত অস্থির।

এ সবও উদ্ভট ভাবনা সন্দেহ নেই। মনের বালাই আছে বলেই মনের বিরুদ্ধে এ বিদ্রোহ।

তবু উদ্ভট ভাবনাও এখন ভাল। পশুদের প্রশান্তির সেই কবিতাটা কার এখন মনে পড়ছে না। আশ্চর্য লাগে ভাবতে যে সে এককালে কবিতা পড়ত।

শুধু কবিতা পড়ত কেন, প্রথম কলেজে ঢুকে কলেজের কাগজে একটা গল্পও লিখে ফেলেছিল।

অধ্যাপকেরা কেউ কেউ প্রশংসা করেছিলেন।

কি সে গল্পটা? কিছু কিছু মনে পড়ছে। মনে পড়ে হাসিও পায়। তখন ধারণা হয়েছিল, খুব একটা সাহসিক আধুনিক গল্প লিখে ফেলেছে।

ভাষার দোষত্রুটি যা থাক, গল্পের বিষয়টিতে জোরাল কিছু আছে বলে মনে মনে একটু অহঙ্কার ছিল।

কি ছিল গল্পটায়?

না, একেবারে অসামাজিক দুর্দান্ত কিছু নয়। তবে তখনকার সদ্য কলেজে ওঠা মেয়ের পক্ষে কল্পিত বেশ অসাধারণ একটি গল্প।

সকলের মতের বিরুদ্ধে, ভুল করে একজন চরিত্রহীন প্রতারককে বিয়ে করে, স্বামীর সত্যকার পরিচয় পাবার পর নিজেই যে স্বামীকে রাজদ্বারে দণ্ডিত করতে সাহায্য করেছিল এমন একটি মেয়ের কাহিনী। প্রেমের চেয়েও জীবনের সত্য বড় এইরকম একটা কথা সে গল্পে উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলবার চেষ্টা করেছিল।

সে কথার দাম এখনও তার কাছে কিছু আছে কি?

অমন কাটাছাঁটা সত্য ধরে থাকতে জীবন দেয় কই!

ঘরটা অন্ধকার হয়ে এসেছে এই বিকেলেই। বাইরে হঠাৎ বৃষ্টি নেমেছে।

জামাটার সেলাই শেষ করে তুলে রাখতে যাচ্ছে এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল। দরজা ভেজানই ছিল।

কে ? বলে সাড়া দিতেই দরজাটা একটু ঠেলে নিখিল বক্সীকেই উঁকি দিতে দেখা গেল।

আসব ?

এক পা যে ভেতরে বাড়িয়েই দিয়েছে ইতিমধ্যে, তাকে আসুন ছাড়া আর কি বলা যায় এখন।

আপনার জামাটা সেলাই হয়ে গেছে। নিয়ে যান। শোভনা জামাটা নিখিলের হাতে তুলে দিলে।

নিখিলের কিন্তু নড়বার নাম নেই। ঘরের এদিক্ ওদিক্ চেয়ে বললে, বলে ত দিলেন নিয়ে যান। এখন যাই কি করে ? কিরকম বৃষ্টি দেখেছেন ত। এটুকু আসতেই ত ভিজে গেলাম।

নিখিল বক্সী ভিজে গেছে সত্যি। বাইরে বৃষ্টিটা বেশ জোরেই পড়ছে।

শোভনা অবশ্য বলতে পারত, ভিজে আসতে যখন পেরেছেন তখন যেতে আপত্তি কিসের ?

কিন্তু কথার রূঢ়তাটা একটু মোলায়েম করেই বললে, ভিজে তাহলে এলেন কেন ? একটু পরে এলেই পারতেন।

যা উচিত তা কি সব সময়ে পারা যায় ! নিখিলের ধরনধারণে ঘর ছেড়ে যাবার কোন লক্ষণ নেই। এদিক্ ওদিকে আর একবার চোখ বুলিয়ে প্রশংসার সুরে বললে, আপনি ত ঘরসংসার বেশ সংক্ষেপ করে নিয়েছেন দেখছি। একেবারে streamlined যাকে বলে। আজকালকার যুগে এই না হলে চলে ! আর আমার মার ঘরে গিয়ে দেখুন না একবার। আমার জন্মের আগে থেকে যেখানে যা ছিল তার কিছু মা ফেলতে রাজি নয়। ঘরটি আমাদের পরিবারের ঐতিহাসিক যাদুঘর বলতে পারেন। এদিকে সেকেলে চকমেলানো দালান যে চোরকুঠুরি হয়ে এসেছে, মার সে খেয়াল নেই। জিনিসপত্রের জ্বালায় আমাদেরই ঘরে আর জায়গা হয় না।

নিখিলের সঙ্গে এই অবান্তর আলাপ দীর্ঘ করার বাসনা শোভনার

নেই। সে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে একরকম নীরস কণ্ঠেই বললে, বৃষ্টিটা একটু কমেছে বোধ হয়। উড়ো মেঘের বৃষ্টি।

নিখিল বক্তার কাছে এ ইঙ্গিত ব্যর্থ। শেষের এই অসতর্কভাবে বলা কথাটকুই তার পক্ষে যথেষ্ট।

ওই উড়ো মেঘের বৃষ্টি নিয়েই ত মুশকিল। বুঝেছেন? কখন আসবে যাবে কিছু ঠিক নেই। অবশ্য এক হিসেবে সমস্ত পৃথিবীটা শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত হলেও ভাল লাগত না। আচমকা সব কিছু হয় বলেই আমাদের মত ভাগ্যবানেরা তবু জীবনে একটু রসকষ ঝাঁজ পায়। এই দেখুন না···

শোভনা মাঝপথেই বাধা দিয়ে বললে, আপনার জামাটা ঠিক সেলাই হয়েছে তো? দেখেছেন?

ও, জামাটা! নিখিল একবার জামাটার দিকে চোখ বুলিয়ে বললে, হ্যাঁ, ও ঠিক আছে। ও পকেট তো কিছু রাখবার জন্যে নয়, শুধু মাঝে মাঝে নিজের হাত গলাবার জন্যে। তবে বুঝেছেন কি না, আজ এ জামাটা না হলেই চলত না। জামা তা বলে আমার এই একটি মনে করবেন না। দস্তুর মত আরও ছটি আছে। একটি রীতিমত গিলে করা, পরে বেরুলে কে না বলবে ভদ্রলোক। তবে সেটি ত আর যখন তখন ব্যবহার করা যায় না! আর একটি ধোপার বাড়ি থেকে আর ফিরছে না। ধোপা বোধ হয় বাকি মজুরীর দরুন সেটা বাজেয়াপ্তই করে নিয়েছে এতদিনে। সুতরাং এই জামাটি দিয়েই আজ অসাধ্যসাধন করতে হবে। এটি আবার আমার অত্যন্ত পয়া জামা, জানেন? প্রথম পরে গেলে একেবারে নির্ঘাৎ বাজি মাৎ, কাজ একটা জুটে যাবেই তা সে একবেলারই হোক বা এক মাসের···

হঠাৎ নিজেই বক্তৃতা থামিয়ে নিখিল শোভনার উৎসাহহীন মুখের দিকে চেয়ে বললে, এই দেখুন, নিজের মনের উচ্ছ্বাসে আসল কথাটাই ভুলে যাচ্ছিলাম।

আসল কথা ত জামাটা। শোভনা না বলে পারল না।

না, না, জামা হবে কেন ? জামাটা ত একটা ছুতো।

ছুতো !—শোভনা রাগবে, না অবাক্ হবে বুঝতে পারল না।

না, মানে মিথ্যে ছুতো নয়, সত্যিই জামাটা সেলাই না করলে চলত না আজ। আর মা সেলাই করতে পারেন না তাও যেমন সত্যি, ঘরে ছুঁচসুতো নেই তাও তেমনি। আমি অবশ্য আপনার কাছে ছুঁচসুতো নিয়ে কোন রকম ফোঁড় সেলাই দিতে পারতাম।…

আপনার আসল কথাটা কি ?—শোভনার গলা বেশ কঠিন।

এই দেখুন ! আপনি যেন সাংঘাতিক কিছু ভাবছেন মনে হচ্ছে ! সাংঘাতিক-টাংঘাতিক কিছুই নয়। সামান্য আমার একটু কৌতূহল। মা বলছিলেন, আপনার স্বামীকে নাকি অনেক দিন ধরে দেখছেন না। তিনি বাইরে কোথাও গেছেন বুঝি ?

নিখিল উত্তরের জন্যে থামলে শোভনা সত্যিই বিপদে পড়ত, কিন্তু সে এক নিঃশ্বাসে বলে চলল—এতদিন ত দিনের বেলা কারুর খোঁজখবর নিতে পারি নি। তাই ভাবছিলাম, তিনি এলে একটু আলাপ করতাম। তিনি আসছেন কবে ?

জানি না। শোভনার উত্তর দিতে দেরী হল না।

জানেন না ! বাঃ ! তা এখন তিনি আছেন কোথায় ?

বেশ খানিকটা নীরবতার পর শোভনার কঠিন গলার জবাব এল—জানি না।

পাঁচ

পরের মুহূর্তটা একান্ত অস্বস্তিকর হয়ে উঠতে পারত।

আর কেউ হলে শোভনার গলার স্বরে ও বলার ধরনেই ব্যাপারটার মধ্যে একটা গোলযোগ অনুমান করে নিত বোধ হয়।

কিন্তু নিখিল বক্সী সে ধার দিয়েই গেল না।

উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠে বললে, ও, একটু রাগারাগির পালা চলছে

বুঝি! দেখুন আমার কাছে পর্যন্ত ধরা পড়ে গেলেন! কিন্তু ভদ্রলোককে না জেনেই তাঁর হয়ে একটু ওকালতি না করে পারছি না। তাঁর ক্যান্‌ভাসার গোছের কোন টহলদারী চাকরি বলেই মনে হচ্ছে। তাতে সব সময়ে খবরাখবর নেওয়া-দেওয়া কি শক্ত তা ত আপনি বুঝবেন না। আরে, আমি নিজে যে ও কাজও করেছি কিছুদিন। ভুক্তভোগী হিসেবে তাই জানি। এ ত আর হোমরা-চোমরাদের টুর-প্রোগ্রাম নয়। একচুল এদিক্-ওদিক্ নড়-চড় হবে না।···

শোভনা অস্বস্তিতে শুধু নয়, কতকটা অধৈর্যে ও জেদেই বাধা দিয়ে একবার বলবার চেষ্টা করলে, আপনি ভুল করেছেন···

কিন্তু নিখিলের তখন নিজের কথাই পাঁচ-কাহন। বাধাটা গ্রাহ্য না করেই বলে চলল, ভুল করব কেন? কিচ্ছু ভুল করি নি। চাকরিটা কি তাই না-হয় জানি না, কিন্তু ঘোরাফেরার চাকরি ত বটে। সুতরাং অমন চিঠির গোলমাল এক-আধবার হয়-ই।

শোভনা আর প্রতিবাদ না জানিয়ে নিখিলের ধারণাটাকেই প্রশ্রয় দেওয়া এক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত মনে করলে। একটু ম্লান হেসে বললে, আপনি যা বুঝতে চান বুঝুন, কিন্তু ও প্রসঙ্গ এখন থাক।

থাকবে কেন? নিখিল বক্সী নাছোড়বান্দা,—ব্যাপারটা কি জানেন! আপনারা, এ যুগের মেয়েরা, গাছেরও খেতে চান, তলারও কুড়োতে। এদিকে স্বাধীন হবেন, আবার পরাধীনতার সুবিধেগুলো ষোল আনা আদায় করে ছাড়বেন।

শোভনা অবশ্য বলতে পারত কঠিন হয়ে, আপনার সঙ্গে মাত্র আজ সকালে আলাপ নিখিলবাবু, এ সব কথা আলোচনা করে আপনি একটু বেশী অনধিকার চর্চা করছেন না কি?

কিন্তু মনে এলেও মুখে তা বলতে পারল না। তার বদলে নিখিল বক্সীর কথাটারই খোঁচ ধরে একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলে, পরাধীনতার সুবিধেটা কি বস্তু! একটু যেন উল্টো কথা শুনছি।

উল্টো নয়, সোজা সত্য। শুধু আমাদের দেখার দোষে উল্টো। পরাধীনতারই ত যত কিছু সুবিধে, যত দায় সব স্বাধীনতার। পরাধীন সেজে মেয়েরা কি সুবিধে ভোগ করতেন জানেন না! ভরণ-পোষণ ত বটেই, তা ছাড়া বিবেকের বালাই যাদের একটু-আধটু ছিল তাদের কাছ থেকে এক রকম নৈতিক জুলুমের জিজিয়া। আহা, ওরা অবলা, আহা, ওরা বন্দিনী অসহায়। সুতরাং সব কিছুতে ষোল আনার ওপর আঠার আনা আস্কারা দাও। আমার মতে এ যুগের স্বাধীনের সঙ্গে স্বাধীনার বিয়ে তাই অন্য রকম বোঝাপড়ার ওপর হওয়া উচিত। প্রত্যেকের বেলা আলাদা চুক্তি, শুধু কয়েকটা সামাজিক নিয়মকানুন মানলেই হল।···

নিখিল নিজেই তারপর হো হো করে হেসে উঠল, আমাকে চিনে ফেলেছেন এতক্ষণে বোধ হয়। একবার সুরু করলে আর থামতে পারি না। কোথা থেকে কোথায় যে চলে যাই। আচ্ছা, বৃষ্টিটা সত্যিই থেমেছে। চলি।

নিখিল সত্যিই আর একটি কথাও না বাড়িয়ে চলে গেল। যেমন আচমকা এলোমেলো কথা বলার ধরন, তেমনি আসা-যাওয়া সব কিছু।

যাবার সময় দরজাটা ভেজিয়ে দিয়েও যায় নি।

দরজা দিয়ে বৃষ্টি-ধোয়া আকাশটা দেখা যাচ্ছে, এ বাড়ীর ভাঙা দেওয়ালের ওধারে কটা নারকেল গাছ আর দূরের একটা মন্দিরের চূড়ার মাথায়।

মনটা এই আকাশের মতই প্রসন্ন করে রাখতে পারলে ভাল হয়। কিন্তু পারা যাচ্ছে কই।

নিখিল বক্সী শুধু ঘরের দরজাটা নয়, আরেকটা দরজাও আবার খুলে দিয়ে গেছে। চেষ্টা করেও সেদিক্ থেকে মন ফেরানো যাচ্ছে না।

এ যুগের বিবাহ-বন্ধন অন্য রকম হওয়া উচিত ?

কি রকম ?

দুজন মানুষের ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক ব্যর্থ কি সার্থক হয় শুধু কি বন্ধনের দোষে-গুণে ?

যত শক্ত করেই বাঁধ, কি যত আলগাই দাও, সে সবই অবান্তর।

আইন সর্ত চুক্তি বুঝে কেউ ভালবাসে না, সে-সব বন্ধনের শাসনে ভালবাসাকে জীইয়ে রাখাও যায় না।

নিখিল বক্সীর জীবনের তেমন কোন অভিজ্ঞতা আছে বলে মনে হয় না। পুঁথি-পড়া ভাবনা নাড়াচাড়া করাই বোধ হয় বিলাস। তবু ওর সঙ্গে একদিন তর্ক করতে ইচ্ছে করে।

তর্ক অবশ্য নিজেরই সঙ্গে। তবু একটা উপলক্ষ্য এক-এক সময়ে দরকার হয়।

কিন্তু তর্ক করে লাভ কি ? নিজেই মনে করে অবাক্ হয় যে, একদিন কোন তর্ক ত তার জীবনে ছিল না! জীবন যখন সত্যিই বয়ে চলেছিল তখন প্রশ্ন বা তর্ক ওঠবার কোন অবকাশই ত হয় নি। আজ জীবন হঠাৎ থেমেছে বলেই যেন এত সব বিচার-বিতর্ক শ্যাওলার মত জাগছে।

দুঃখ সেদিন ছিল, অভাব, অভিযোগ, আঘাত। কিন্তু জীবন নিজের বেগে সব তুচ্ছ করে গেছে।

দুঃখের সঙ্গে পরিচয় তার ত অতি ছোট বয়সেই।

সেই মামুলী ইতিহাস। বাবা অকালে মারা গেলেন অনেক দিন রোগে ভুগে ভুগে। পুঁজি-পাটা যা ছিল বাবার চিকিৎসাতেই সব তখন ফুরিয়ে গেছে।

শহরের অপেক্ষাকৃত ভদ্র-পাড়ার বড় রাস্তার ধার ছেড়ে গলির ভেতর বাড়ী বদল করতে হয়েছিল প্রথম। শোভনা তখন কতটুকু আর। আর সকলের কি রকম লেগেছিল জানে না, কিন্তু তার নিজের ত মজাই লেগেছিল মনে আছে। বড় রাস্তার ধারে বলে

আগের বাড়ী থেকে বেরোনো সম্বন্ধে কড়াকড়ি ছিল—পাছে গাড়ী-ঘোড়া চাপা পড়ে। গলির বাড়ীতে সে রকম কোন শাসন নেই। নিজের খুশিতে যখন সুবিধে ঘুরে এস। সেই ট্রাম লাইন পর্যন্ত না গেলেই হল।

ট্রাম লাইন পর্যন্তও একদিন গেছল একা একা সাহস করে।

সেইখানেই বড় মামা ধরে ফেলেছিলেন। তারপর বাড়ীতে এনে কি বকুনি মাকে। মেয়েটাকে একেবারে ইল্লুতে হাঘরের মেয়ে করে ছাড়ছ! আজ ওই ছেঁড়া ময়লা ফ্রক পরে ভিখিরীদের মেয়ের মত দেখি ট্যাঙ্গস্ ট্যাঙ্গস্ করে ট্রাম লাইনের ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কারুর কাছে যে হাত পাতে নি তারই বা ঠিক কি?

মা গম্ভীর হবার ভান করে বলেছিলেন, হ্যাঁ রে, হাত পেতেছিলি নাকি? কই, দেখি কত পেলি?

মা'র কথার ওই ধরন চিরকাল। তাতে হাস পাওয়াই উচিত। কিন্তু বড় মামা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছিলেন। রেগে বলেছিলেন, দোষ ত তোর! মায়ের শিক্ষা না থাকলে ছেলেমেয়ে মানুষ হয়? আমার আর কি বল না! ভাগনীর জন্যে তো আমার মুখে আর চুন-কালি পড়বে না, কিন্তু ছ-আনির মজুমদার বংশের নাম যে রসাতলে যাচ্ছে!

বকুনিটা এখনও যে প্রায় মুখস্থ আছে তার কারণ ওই বকুনিরই একটু হেরফের ফ্রক ছেড়ে শাড়ী পরা পর্যন্ত কতবার যে শুনেছে তার হিসেব নেই। বড় মামার আর্তনাদই ছিল ওই এক ভয় নিয়ে—ছ-আনির মজুমদার বংশের নাম ডুববে।

একটা কিছু খুঁত পেলেই ওই কথাই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলতেন।

মা ঠাট্টা করে হাল্কা করে দিলেও প্রথমবারের বকুনিতে সত্যি ভয় পেয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন বাদে তার কাছেও এটা হাসর ব্যাপার হয়ে উঠেছিল।

বড় মামা বকুনি সুরু করতেই মনে আছে একবার জিজ্ঞাসা

করেছিল, ছ-আনি মানে কি বড় মামা? মজুমদারদের শুধু ছ-আনা পয়সা ছিল?

তা তো বলবিই রে হতভাগী! বড় মামার রাগটা প্রায় কাঁদুনি হয়ে উঠেছিল, নিজের বংশের কিছু ত আর জানলি নে। আর জানবিই বা কি করে? সে রব্‌রবার দিনে তো আর আসবার ভাগ্যি করিস নি। মজুমদারদের দরজায় হাতী বাঁধা থাকত, বুঝেছিস!

তার পর সে দরজা ভেঙে হাতী ভেতরে ঢুকল আর মজুমদাররা বেরিয়ে এল জায়গা না পেয়ে, না দাদা? মা তাঁর নিজস্ব ধরনের চিম্‌টিটুকু কেটে মুখ টিপে হেসেছিলেন।

বড় মামা হতাশ ভাবে হাত নেড়ে বলেছিলেন, মজুমদার বাড়ির বউ হয়ে তুইই যদি অমন ঠাট্টা করিস সুরো, তাহলে তোর মেয়ের এমন হাঘরে হালচাল হবে না কেন? আরে, আমি ত আর বানিয়ে কিছু বলছি না! জামজুড়িতে মজুমদারদের গড়-বাড়ী দেখে এখনও লোকে হাঁ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। এই আমাদের বংশই ছিল আখখুটে হাঘরে। না-চাল না-চুলো! নিজের বংশ বলে ত আর বাড়িয়ে বলতে পারব না। মজুমদার বাড়িতে মেয়ে দিতে পেরে আমরা বর্তে গিয়েছিলাম, বুঝেছিস!

যাব, একবার নিয়ে যাব তোকে সে গড়-বাড়ী দেখাতে। বড় মামা শোভনাকেই লোভ দেখিয়েছিলেন তার পর।

একটু আতর-টাতর মেখে যেও দাদা। বড় নাকি বাদুড়-চামচিকের গন্ধ। বলে মা আর সেখানে দাঁড়ান নি।

বড় মামা শোভনাকেই সালিশ মেনেছিলেন নিরুপায় হয়ে—শুনলি, তোর মা'র কথা শুনলি! নিজের শ্বশুরবাড়ি নিয়ে এমন ঠাট্টা-মস্করা কোন মেয়ে করে! আরে, আজই না হয় তারা পড়ে গেছে। কিন্তু তারা রাজা ছিল, বুঝেছিস, রাজা!

এ ধরনের মজার বকাবকি তাদের বাড়িতে অনেকবার হয়েছে।

বড় মামা সত্যিই ছিলেন নেহাৎ সাদাসিধে ভালমানুষ। নিজের চেয়ে ভগ্নীপতির বংশমর্যাদাই তাঁর কাছে সব। তাই নিয়েই তাঁর যত মাথাব্যথা।

মাথাব্যথার কারণ শোভনাই বেশীর ভাগ হয়েছে অবশ্য।

ছেলেবেলাতেই মা'র আলগা শাসনে যেখানে-সেখানে যখন-তখন ঘুরে বেড়ানো তার স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মা সত্যিই কখনও এ নিয়ে রাগ করেন নি। তাঁর শাসনের ধরনই ছিল আলাদা। বড় মামাই মজুমদার বাড়ীর মেয়ের ভবিষ্যৎ ভেবে হা-হুতাশ করতেন মাঝে মাঝে।

কিন্তু বড় মামাও শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে মুখ বন্ধ করেছিলেন।

তখন সে গলির বাড়ীও ছেড়ে তাদের শহরতলির নোংরা ঘিঞ্জি পাড়ায় উঠে যেতে হয়েছে। পাকা ছাদের বদলে টিনের চালা। সেখানেও চালানো দায় হয়েছে মা'র। শোভনা তখন বড় হয়ে বুঝতে শিখেছে। বুঝেছে কিন্তু সে নিজের থেকেই। মা তাকে কোনদিন কিছু বলেন নি। তাঁর তা স্বভাবই নয়। তাঁর চিরকাল সেই সদাপ্রসন্ন মুখ, সেই সব কথায় নির্দোষ চিমটি কাটা স্বভাব।

শোভনা তখন স্কুলে পড়ছে। স্কুলের বেড়া পার হতে আর বেশী দেরীও নেই। অত অভাব-অনটনের ভেতরও মা তাকে স্কুল থেকে ছাড়ান নি। বড় মামারও সে ইচ্ছে ছিল না। তবু তিনিও একদিন নিরুপায় হয়ে বলেছেন, ভাবছিলাম কি জানিস সুরো, শোভা আর স্কুলে যদি না যায় ত ক্ষতিটা কি? বাড়ী থেকেও ত পড়ে পরীক্ষা দেওয়া যায়।

শোভনা ঘরের ভেতর থেকে পড়া থামিয়ে বারান্দার দিকে কান খাড়া করে রেখেছিল মা'র উত্তরের জন্যে। মা ও বড় মামা বাইরের বারান্দায় বসেই কথা বলছিলেন। একটি ঘর আর বারান্দা নিয়েই তাদের বাসা।

মা'র উত্তর দিতে একটু দেরী হয়েছিল; কিন্তু শেষে তাঁর সেই

নিজস্ব ধরনে বলেছিলেন, বাড়ীতে থেকে পড়লে বিছে বড় বেশী হয়ে যাবে দাদা! তখনও মেয়েকে সামলানো দায় হবে!

বড় মামা আর কিছু বলেন নি।

তাঁর অবশ্য উদ্বিগ্ন হবার কারণ ছিল। বাবার মৃত্যুর পর জীবনবীমা থেকে মা কিছু পেয়েছিলেন। তাই দিয়েই তাদের চলে এসেছে কোন রকমে। একটা আশা ছিল, দেশের জমিজমা সম্পত্তির ভাগ বিক্রী করে কিছু পাওয়া যাবে। কিন্তু পাঁচ শরিকের ঝগড়ায় মামলা-মকদ্দমায় সে আশা আর সফল হয় নি। বড় মামার নিজের একপাল ছেলেপুলের সংসার। একটি মাত্র বোন অত্যন্ত আদরের বলে যতখানি সম্ভব তার সব দায় আদায় সামলাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু নিজে থেকে সাহায্য করবার ক্ষমতা নেই। ক্ষমতা থাকলেও মা তা গ্রহণ করতেন না নিশ্চয়। বাবার মৃত্যুর পর বড় মামার অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁর বাড়ীতে গিয়ে আশ্রয় নেন নি। নিজে আলাদা হয়ে থেকেছেন সমস্ত অসুবিধে সত্ত্বেও। বোনের মন মেজাজ বুঝে বড় মামাও একবারের বেশী অনুরোধ করেন নি।

সেই বড় মামা হঠাৎ মারা যাওয়ার পরই সত্যিকার অকুলপাথার কাকে বলে তারা বুঝল। শোভনা স্কুলের পড়া শেষ করে তখন কলেজে সবে ঢুকেছে। সে কলেজে পড়া তাকে ছাড়তে হল; শহরতলির সে বাসার ভাড়া গোনাও আর সম্ভব হল না। উঠে আসতে হল সেই আধা-বস্তির পাঁচ ভাড়াটের এজমালি বাসায়, যেখান থেকে তার জীবনের অপ্রত্যাশিত নতুন বাঁক সুরু।

মা কি এবার ভেঙে পড়েছিলেন?

না, এতটুকু না। ভাগ্য যত নির্মম হয়েছে মা'র সেই প্রসন্ন কৌতুকের উৎস তত যেন উচ্ছল হয়ে উঠেছে।

পাড়া-পড়শীরা কেউ হয়ত এসে বলেছে, হ্যাঁগা, এবার মেয়ের বিয়ে দিলে হয় না!

মা গম্ভীর হয়ে বলেছেন, তা হয় বইকি দিদি। দিলেই ত হয়। শুধু বেয়াই পছন্দ হয় না যে!

কেউ বুঝে হেসেছে। কেউ না বুঝে মনে মনে বিরক্ত হয়েছে।

আগেকার দিন কি গাঁ দেশ হলে হয়ত কথা উঠত, নিন্দে রটত। কিন্তু সে-সব কিছু অন্ততঃ হয় নি। এই আধাবস্তির পাড়ায় রসালো পরচর্চা হয় না এমন নয়, কিন্তু আইবুড়ো মেয়ের বয়স তার বিষয়ের মধ্যে বড় একটা পড়ে না।

অভাবের সত্যিকার গ্লানি ও জ্বালা যে কি, তখনই প্রথম বুঝতে হয়েছিল। তার আগে পর্যন্ত যেমন করে হোক তাকে অনেকখানি আড়ালেই রাখা হয়েছে। রেখেছে অবশ্য মা আর বড় মামা। বড় মামাই বুঝি বেশী। সেই সাদাসিধে ভালমানুষ সংসারের সঙ্গে যুঝবার অনুপযুক্ত বড় মামা, যিনি নিজের একপাল ছেলেপুলের সংসার কোন রকমে চালিয়েও বোনের দায় ঘাড়ে নেবার সময় করে নিয়েছেন। যোগ্যতার অভাবে বুদ্ধির দোষে হয়ত অনেক ভুলই করেছেন, মামলা-মকদ্দমায় পাকা ঘুঁটি কাঁচিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু শোভনা কি তার মা'র গায়ে আঁচটি যাতে না লাগে তার চেষ্টার ত্রুটি করেন নি।

বড় মামার মৃত্যুর পর শোভনাকেই সব কিছুর দায় নিতে হয়েছে। বাবার জীবনবীমা থেকে পাওয়া টাকা পোষ্টাপিসে জমা ছিল। তারই আসল আর সুদ ভাঙিয়ে ভাঙিয়ে এতদিন চলত। শোভনা খবর নিতে গিয়ে জেনেছে, যে-তলানিটুকু তার অবশিষ্ট আছে তা দিয়ে তাদের মা-মেয়ের ছুটো মাসের নুন ভাত বড় জোর জুটতে পারে। অবাক্ কিন্তু তাতে হয় নি, অবাক্ হয়েছে বড় মামার এমন আশ্চর্য ভাবে এই সময়টিতেই মারা যাওয়ায়। তিনি যেন আর এ করুণ প্রহসন টানতে পারবেন না বুঝেই নিজের যবনিকা ফেলবার সময়টা নিজেই বেছে নিয়েছিলেন।

শোভনা প্রথমে দিশাহারা হয়ে পড়েছিল বটে, কিন্তু মা'র মত

শক্তি না থাক, হতাশায় ভেঙেও ত পড়ে নি! বরং কেমন একটা উত্তেজনাই অনুভব করেছে এই পাহাড়-প্রমাণ দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে লড়তে হবে বলে।

তা ছাড়া তার জীবনে তখনই আর এক ঢেউ দোলা দিতে শুরু করেছে।

অনুপমের সঙ্গে তখনই তার পরিচয়।

শোভনার হঠাৎ চমক ভাঙে। আশুবাবুর চাকর মধু এসে ডাকছে।

সত্যিই ত! অনেক আগেই তার ওঠা উচিত ছিল। লজ্জিত হয়ে সে তাড়াতাড়ি আশুবাবুর ঘরের দিকে যায়।

কিন্তু যেতে যেতে তার মন কেমন যেন বিদ্রোহ করে ওঠে। ভাগ্যের এই অনুগ্রহটুকুতে কৃতজ্ঞতার বদলে যেন জ্বালাই ধরে মনে।

কোন রকমে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকার এই সুবিধাটুকু পেয়েই সে কি নিজেকে কৃতার্থ মনে করবে?

ছয়

নিখিল বক্সী তার ঘরের অবস্থা বাড়িয়ে বলে নি।

দু'টি মাত্র ঘর। দু'টি অবশ্য গুণতিতে, নইলে একটি মাঝারি আকারের ঘরের পাশে আরেকটি গাধাবোটের সঙ্গে লাগাও ডিঙ্গি মাত্র। গাধাবোটের মতই বড় ঘরটি বোঝাই। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্তই বলা যেত। তবে সেকেলে বাড়ী বলে ছাদ বেশ উঁচু। উপরদিকে কিছু ফাঁক তাই আছে।

নিখিল জিনিসপত্র সমেত মাকে বড় ঘরটিই ছেড়ে দিয়েছে। নিজে ছোট ঘরটিতেই থাকে। এ ঘরটিও খুব যে ফাঁকা তা নয়। তবে মা'র ঘর যদি অতীতের স্মৃতি হয়, নিখিলের নিজের ঘর বর্তমানের বিশৃঙ্খলা।

বিশৃঙ্খলা বই কাগজ পত্রেরই বেশী। পুরানো গাদা গাদা ইংরেজী পত্রিকা আর ফুটপাথের সেকেণ্ড হ্যাণ্ড বইয়ের দোকানের বই এলোমেলো ভাবে মেঝে থেকে ছোট কেরাসিন কাঠের টেবিল, মায় নেয়ারের খাটিয়ার ওপর পর্যন্ত ছড়ান।

নিখিল শোভনার ঘর থেকে এসে নিজের ঘরে ঢুকে এক পাশের ছোট আলনাটায় শোভনাকে দিয়ে সেলাই করিয়ে আনা জামাটা রেখে বিছানাতেই শুয়ে পড়ে অনেকক্ষণ ক'টা বই-কাগজ খাপছাড়া ভাবে নাড়াচাড়া করেছে। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘরে ঘনিয়ে আসার পর সে উঠে পড়ে জামাটা গায়ে দিতে গিয়ে কি যেন ভাবে, তার পর সেটা হাতে নিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে সামনের দরমা দিয়ে ঘেরা বারান্দার ফালির সামনে গিয়ে ডাকে, মা শুনছ?

দরমা দিয়ে ঘেরা বারান্দার অংশটুকুই মা'র রান্নাঘর। ভেতর থেকে একটা হ্যারিকেনের আলো দেখা যায়। মা এই রান্নাঘরটুকুর যথাসাধ্য শুচিতা বজায় রাখবার যে চেষ্টা করেন নিখিলের পরের কথাতেই তা বোঝা যায়।

শীগ্‌গির এসো মা। নইলে রান্নাঘরে ঢুকে পড়ব। নিখিল একটু চেঁচিয়েই কথাটা জানায়।

বয়সের দরুন মা কানে একটু কম শোনেন। কিন্তু রান্নাঘরে ঢোকবার কথা তাঁর ঠিক কানে যায়।

উনুনে কি একটা কড়ায় চাপিয়েছিলেন। সেটা তাড়াতাড়ি নামিয়ে বলেন, এই যে, যাচ্ছি বাবা। এখুনি যাচ্ছি। রান্নাঘরে বাসী কাপড়ে যেন ঢুকিস নি।

মা বেরিয়ে আসার পর দরকারী কথাটা আপাততঃ স্থগিত রেখে নিখিল বলে, আচ্ছা মা, আমি তোমার সবে-ধন মাণিক, একটা মাত্র ছেলে। আমি রান্নাঘরে ঢুকলে তোমার সব যদি অশুদ্ধ হয়ে যায় তাহলে অমন শুদ্ধ থেকে লাভ কি?

মা একটু হাসেন মাত্র। বোঝা যায় ছেলের এ ধরনের দুষ্টুমির অভিযোগ নতুন নয়।

কিন্তু আজ যেন নিখিল কথাটাকে হাসি-ঠাট্টার ভেতরেই শেষ করতে চায় না, বলে, চুপ করে রইলে কেন? বলো। ধর তুমি ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে পুণ্যি করে স্বর্গে গেলে, আর সেখানে তোমায় একেবারে গঙ্গাজলে-ধোয়া গোবরমাটি-লেপা একটি পবিত্র কুঁড়ে-ঘরে থাকতে দিল। কিন্তু সেখানে আমায় যদি ঢুকতে না দেয়, সে স্বর্গে থেকে কোন্ সুখ পাবে তুমি?

মা হেসে বলেন, তুই কি দরকারী কথা বলবি বল্, আমি রান্না নামিয়ে এসেছি।

তবু নিখিল নাছোড়বান্দা: এটাও দরকারী কথা মা। আজ একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাওয়া দরকার। হয় তুমি ছোঁয়াছুঁয়ি ছাড়ো, নয় আমায় ছাড়ো। তুমি যে ভাবছ, মা না থাকলে তোমার হতভাগা ছেলে একেবারে অকূলপাথারে, তা কিন্তু নয়। এই দেখ, জামাটা কি রকম সেলাই করিয়ে এনেছি, দেখেছ!

নিখিল এইবার হাসতে হাসতে জামাটা তুলে দেখায়।

তা বেশ করেছিস। মা নিজের কাজে ফিরে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে বলেন, তোর এই ত দরকারী কথা!

উঁহু, উঁহু, দাঁড়াও। নিখিল বাধা দেয়।

ছেলের এ ধরনের পাগলামি মা'র জানা। নিরুপায় হয়ে তিনি বলেন, আচ্ছা, দাঁড়াচ্ছি। কিন্তু ওদিকে উনুন যে জ্বলে যাচ্ছে। রান্নাবান্না শেষ করতে হবে না?

কি যজ্ঞির রান্না করছ মা? বাজার থেকে কি এনেছি তা ত জানি। ওই কুমড়ো বেগুন ত আর তোমার পুণ্যির জোরেও পোলাও কালিয়া হয়ে উঠবে না? হ্যাঁ, শোন, কই, কে সেলাই করে দিয়েছে ত জিজ্ঞাসা করলে না?

মা'রও এতক্ষণে কথাটা খেয়াল হয়। একটু কৌতূহল ভরেই জিজ্ঞাসা করেন, কে দিল, কে ?

তুমিই বল না ভেবে !

মাকে বেশী ভাবতে হয় না। একটু পরেই বলেন, ও ঘরের ওই বৌটি ? ওই শোভনা ?

বলার সময় চোখে-মুখে একটু অপ্রসন্নতার ভ্রূকুটিও বুঝি ফুটে ওঠে।

হ্যাঁ। নিখিল হাসে : তোমার যেন খুব পছন্দ হল না মনে হচ্ছে ?

না, সেলাই করে দিয়েছে ভালই ত। মা তাঁর মনের কি একটা সংশয় যেন লুকোতে পারেন না,—কিন্তু মেয়েটি কেমন যেন···

মা'র কথার মাঝখানেই নিখিল বলে, অদ্ভুত ত ? আমারও ঠিক তাই মনে হল। তাই তোমায় জিজ্ঞাসা করতে এলাম।

আমি কি কিছু জানি বাবা যে, আমায় জিজ্ঞাসা করছিস্। কিন্তু মেয়েটির কিছু একটা গোলমেলে ব্যাপার আছে বলে মনে হয়। ওর সঙ্গে মেলামেশা তাই না করাই ভাল।

হুঁ, তাহলেই তোমার সোনার চাঁদ ছেলের গায়ে কলঙ্ক পড়ে যাবে ! হেসে উঠে নিখিল আবার জিজ্ঞাসা করে, ওঁর স্বামীকে তুমি ত দেখেছ মা ?

হ্যাঁ, প্রথম দু'চার দিন দেখেছিলাম, তার পর আর ত বহুদিন আসে নি। মা নিজের মনের ভাবটা স্পষ্ট করবার চেষ্টায় বলেন, মেয়েটি কিন্তু ভদ্র, লেখাপড়া-জানা বলেই মনে হয়।

তুমি তাহলে আলাপ-সালাপ করেছ ! নিখিল হাসে।

হ্যাঁ, প্রথম দিকে করেছিলাম। কিন্তু মেয়েটি দেখলাম মেলামেশা পছন্দ করে না, দূরে দূরে থাকতে চায়। তাই আর চেষ্টা করি নি।

হুঁ। বলে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে নিখিল নিজের ঘরের দিকে চলে যায়।

মা ছাড়া পেয়ে রান্নাঘরেই গিয়ে ঢোকেন, তবে একটু চিন্তিত মুখে

আশুবাবুর কোন কিছুতে আতিশয্য বড় একটা এ পর্যন্ত শোভনা দেখে নি। কিন্তু আজ রান্নার ব্যাপারে যেটুকু অতিরিক্ত ব্যবস্থা তিনি করেছেন, শোভনার তাতে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ হয়।

মধুকে দিয়ে বিকালের বাজার তিনি ইতিমধ্যেই করিয়ে আনিয়েছেন। সে বাজার শুধু তরিতরকারীর নয়, তার মধ্যে আমিষও আছে। প্রথমে অবশ্য শোভনা সে কথা জানতে পারে নি।

মধু ডেকে নিয়ে আসবার পর আশুবাবুর সঙ্গে তার দু'চারটে কথা হয়েছে মাত্র। আশুবাবু কোথায় কি কাজে বেরিয়ে যাবার জন্যে তখন প্রস্তুত।

তাকে দেখে সস্নেহ স্মিতমুখে বলেছেন, বুড়োকে কি ভুলেই গেছলে নাকি! বাজার-টাজার সব ওঘরে আছে। আর কিছু দরকার-টরকার হয় ত আনিয়ে নিয়ো। এই টাকা দু'টো রাখ।

আশুবাবু দু'টো টাকা এগিয়ে ধরেছেন। কিন্তু শোভনা তা নিতে চায় নি। বলেছে, না, টাকার কি দরকার! ভাঁড়ারে কি আছে না আছে আমি ত দেখেছি। কিছু লাগবে না।

তবু রাখলে দোষ কি? দু' টাকা নিয়ে তুমি যদি পালিয়ে যাও, যাবে। বলে হেসে আশুবাবু টাকাটা দিয়ে বেরিয়ে গেছেন।

টাকাটা নিতে অত্যন্ত সঙ্কোচ হয়েছিল। রান্নাঘরে এসে বাজারের থলিতে মাছ দেখে সত্যি খারাপ লেগেছে। অনুগ্রহের চেহারাটা বড় স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এর চেয়ে মাইনে-নেওয়া রাঁধুনীর কাজও বুঝি ভাল ছিল। তাহলে কাজটুকু ছাড়া আর কোন বাধ্যবাধকতা থাকত না। থাকত না অনুগ্রহের ঋণ কৃতজ্ঞতায় শোধ করবার অস্বস্তি।

আশুবাবু থাকলে হয়ত সত্যিই একটু অনুযোগ করত এই মাছের ব্যাপার নিয়ে।

কিন্তু তাই বুঝেই আশুবাবু কাজের ছুতোয় বেরিয়ে গেছেন কি না কে জানে।

রান্নার কাজকর্ম করতে শোভনার কিন্তু ভালই লাগে।

মনটাকে ব্যাপৃত রাখার এ সুযোগেরও একটা দাম আছে।

আশুবাবুকে সন্তুষ্ট করতে নয়, নিজেকেই সম্পূর্ণ ভাবে কাজে তন্ময় করবার জন্যে শোভনা একটু নতুন ভাবে দু'একটা পদ রান্নার চেষ্টা করে।

কিন্তু সম্পূর্ণ তন্ময়তা কি সম্ভব? তার পক্ষে অন্ততঃ নয়।

বর্তমানই অদৃশ্য সূত্রে অতীতের স্মৃতিকে টেনে আনে।

মধু বাজার থেকে কই মাছ কিনে এনেছে। মনে পড়ে, কই মাছ কোটা তার কাছে একটা বিভীষিকা ছিল। মা কোনদিন এ সব করতে দেন নি। কিন্তু নিজের সংসারে এসে প্রথম এই কই মাছ কোটা নিয়েই কি হুলুস্থূল ব্যাপার।

অনুপমকে মৃদু ভর্ৎসনা করেছিল প্রথমে, বাজারে আর মাছ পেলে না!

পাব না কেন? অনুপম একটু বিস্মিত হয়ে বলেছিল, কিন্তু কই মাছ ভাল বলে ত আনলাম।

ভাল ত বুঝলাম। কিন্তু এখন জ্যান্ত কই মাছ মারবে কে? ও আমার দ্বারা হবে না।

কই মাছ মারা কি শক্ত নাকি? কখনও কই মাছ আগে কোটো নি? অনুপম সত্যিই অবাক্।

না, কুটি নি। মা কি এ সব করতে দিয়েছে কখনও? খুব ত বাহাদুরী হচ্ছে, কই মাছ কোটা শক্ত নাকি বলে। দেখি, মারো না কই মাছগুলো। এস।

আমি? অনুপমেরই কিন্তু মুখ শুকিয়ে গেছল।

হ্যাঁ তুমি। অনুপমের মুখের চেহারা দেখে হেসে ফেলে বলেছিল শোভনা, বেটাছেলে হয়ে কটা কই মাছ মারতে পার না!

অগত্যা অনুপম এগিয়ে এসেছিল তার পৌরুষ প্রমাণ করতে।

দু'জনে মিলে কই মাছ মারা নিয়ে দস্তুরমত একটা কুরুক্ষেত্র ব্যাপার তারপর। দু'জনেই সমান আনাড়ি। কিন্তু শোভনা অনুপমকেই বকাবকি করেছে আগাগোড়া। তারই দোষ ধরে খুনসুটির ঝগড়া করেছে। সেই ঝগড়া করাটাই একটা আনন্দ।

অনুপম নয়, কই মাছগুলো শেষ পর্যন্ত মেরেছিল শোভনাই। নির্মম ভাবে আছড়ে আছড়ে মেরেছিল। মা এই ভাবে মারতেন মনে পড়ে গিয়েছিল তখন।

অনুপম নিশ্চেষ্ট দর্শক মাত্র তখন। দেখতে দেখতেই সে একটু হেসে বলেছিল, তোমরা আমাদের চেয়ে নিষ্ঠুর।

হ্যাঁ,—শোভনাও হাসতে হাসতে বলেছিল মাছ কুটতে কুটতে, পরের ঘাড় দিয়ে পাপ করিয়ে নিতে পারলে সবাই অমন পুণ্যাত্মা হতে পারে। মারবার বেলা আমার নিষ্ঠুরতা, আর খাবার বেলা দয়াটা তোমার!

কি অর্থহীন অথচ মধুর কথা-কাটাকাটি। দিনগুলো এই সব তুচ্ছ চাঞ্চল্যেই উচ্ছল পরিপূর্ণ।

মাছ কুটতে কুটতেই একটু অন্যমনস্কতায় সেদিন একটা আঙ্গুলও কেটে গিয়েছিল হঠাৎ।

রক্ত পড়েছিল টস্ টস্ করে। অনুপম রক্ত দেখে কেমন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল মনে আছে।

তখন মাছ কোটা ছেড়ে জল দিয়ে কাটাটা ধুচ্ছে।

অনুপম সেদিকে চেয়ে ভয়ে ভয়ে ধরা গলায় বলেছিল, ও কি, রক্ত বন্ধ হচ্ছে না যে!

বন্ধ হচ্ছে না ত হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছ কি! শোভনা হাসিমুখেই ঝঙ্কার দিয়েছিল, একটা ন্যাকড়ার ফালি-টালি নিয়ে আসতে পার না, আর একটু আইডিন যদি পাও!

অনুপম ব্যস্ত হয়েই ঘরের ভেতরে গেছল, কিন্তু অনেকক্ষণ আর ফিরে আসে নি।

শোভনাই কাটা জায়গাটা অন্য হাতের আঙ্গুল দিয়ে চেপে ধরে ঘরে ঢুকে বলেছিল, একটু ন্যাকড়ার ফালি আনতে যে বুড়ো হয়ে গেলে। কি, করছ কি সবকিছু হাঁটকে তছনছ করে!

অনুপম অসহায় ভাবে বলেছিল, খুঁজে পাচ্ছি না যে।

পাবেও না এ জন্মে। শোভনাই রাগ করে গিয়ে বাঁ হাতে একটা তোরঙ্গের ডালা খুলে ছেঁড়া কাপড় বার করে দিয়ে বলেছিল, নাও, একটা ফালি এখন ছেঁড়। তা পারবে ত!

অনুপম তাও ঠিক মত পারে নি। ফালিটা মস্ত চওড়া করে ছিঁড়েছিল।

শোভনা ঝঙ্কার দিয়ে বলেছিল, ও ফালি দিয়ে কি আমি গলায় ফাঁস দেব! একটা ফালি ছিঁড়তেও পার না, অকর্মার ধাড়ি!

অনুপম কাঁচুমাচু মুখে আবার চওড়া ফালিটা দু ভাগ করেছিল ছিঁড়ে।

শোভনার মুখে রাগের ভ্রূকুটি, কিন্তু মনে কি গভীর ভালবাসার আকুলতাই উথলে উঠেছিল এই অসহায় কুণ্ঠিত মানুষটার ওপর।

টিঞ্চার-আয়োডিন একটু কোথা থেকে শোভনাই খুঁজে বার করেছিল তার পর, আর শোভনার ধমক খেতে খেতে অনুপম অপটু হাতে যথাসাধ্য ব্যাণ্ডেজ করে দিয়েছিল কাটা জায়গাটা।

আঙ্গুল কাটার সামান্য ঘটনাটাই সেদিন বিশেষ হয়ে উঠেছিল যেন অর্থময়তায়।

আঙ্গুল কাটার ব্যাপারটার কি ওই দিনেই শেষ?

না, একটু পরিশিষ্টও ছিল। সেই পরিশিষ্টটুকুও না মনে করে পারে না। মনে করলে এখনও কেমন একটু অবাক্ লাগে।

দিন দুয়েক বাদে শোভনা ব্যাণ্ডেজটা খুলে ফেলেছিল কাজের অসুবিধার জন্যে। কাটা জায়গাটা তখনও একেবারে জুড়ে

যায় নি। অনুপমকে খেতে বসিয়ে ভুলে হাতে করেই পাতে নুন দিতে গিয়ে ঘা-টা চিড়বিড়িয়ে ওঠায় নুনটা ফেলে দিয়ে অস্ফুট চীৎকার করে উঠেছিল।

অনুপম পাত থেকে মুখ তুলে অবাক্ হয়ে বলেছিল, কি, হল কি?

কি আবার হল? শোভনা হেসে বলেছিল, জ্বালা করে উঠল দেখতে পাচ্ছ না?

কেন? নির্বোধের মত প্রশ্ন করেছিল অনুপম।

এমনি। বলে ঝঙ্কার দিয়ে শোভনা নুন দেবার চামচ খুঁজতে উঠে গিয়েছিল। ফিরে এসে নুন দিতে দিতে বলেছিল অভিমান করে, আঙুলটা সেদিন কেটে গেল তাও মনে নেই?

ও হ্যাঁ, তাই ত! অনুপম যে ভাবে কথাটা বলেছিল তাতে সত্যিই তার মনে ছিল না বলে সন্দেহ হয়েছিল।

শোভনা আর কিছু বলে নি কিন্তু অবাক্ হয়েছিল, ব্যথাও পেয়েছিল একটু।

সামান্য ব্যাপার। ভুলে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু এমন নয়। কিন্তু অনুপমের আঙুল কাটলে সে কি এমন ভুলে যেতে পারত?

অনুপম কোনদিন তাকে অবহেলা করে নি, আঘাতও দেয় নি। কিন্তু তার সব কিছুই যেন ভাসা ভাসা।

সে নিজেও যেন আলগা মূলহীন একটা সত্তা। একটু দোলা লাগলেই ভেসে যাবে।

ভালবাসা দিয়ে, মমতা দিয়ে এই দুর্বল শিথিল মানুষটাকে একটা দৃঢ় ভিত্তিতে বেঁধে রাখাও তাই একটা উত্তেজনা মনে হয়েছে সেদিন, একটা গোপন গর্ব।

কিন্তু কেন পারল না?

পারে নিই বা কই। হাসপাতালে যাওয়ার আগে পর্যন্ত তার নোঙর খুলে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার কোন আভাসই ত ছিল না।

তার সেই অসুখের সূত্রপাতের দিনগুলিতে অনুপমের বরং একটু

পরিবর্তনই দেখেছে। অনুপম চিন্তিত হয়ে উঠেছে। বেশ একটু

তখন রোজই প্রায় বিকেলে জ্বর আসে। কাশিটা সারতে চায় না।

শোভনা অনুপমকে কিছু বলে নি প্রথমে। বলার প্রয়োজনও মনে করে নি। কিন্তু নিজের মনে তার সন্দেহ হয়েছে তখন থেকেই একটু। সে অজ্ঞ-অশিক্ষিত নয়। নিজের জ্বর ও কাশির কয়েকটা লক্ষণ তার ভালো লাগে নি।

অনুপমকে কিছু না বলে নিজে লুকিয়ে একদিন একটা কাশির ওষুধ কিনে এনেছে।

অনুপম অন্যমনস্ক। কিন্তু কিছুদিন বাদে একদিন শিশিটা তারও নজরে পড়েছে, উদ্বিগ্ন হয়েই জিজ্ঞাসা করেছে, তুমি এ ওষুধটা খাচ্ছ নাকি?

খাচ্ছি ত! শোভনা হেসেছে।

কিন্তু কাশিটা কই সারছে না ত?

ধন্বন্তরি নাকি? যে এক ফোঁটাতেই সেরে যাবে? শোভনা হাল্‌কা ভাবে কথাটা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছে।

কিন্তু অনুপম তাতে আশ্বস্ত হয় নি। আশ্বস্ত যে হয় নি তার পরের দিন বোঝা গেছে।

সকালবেলা কাজে যাবার আগে সে হঠাৎ শোভনাকে তৈরি হয়ে নিতে বলেছে বেরুবার জন্যে।

শোভনা অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করেছে—আমি আবার কোথায় বেরুব এই সকালবেলায়। পাগল হলে নাকি?

না, না, চল না। দরকার আছে। অনুপম তার পক্ষে যেটুকু সম্ভব জোর দিয়ে বলেছে।

কি দরকার শুনি? শোভনা তখনও সত্যিই বুঝতে পারে নি। বলেছে, বায়স্কোপের টিকিট করেছ নাক? তাই বা কি করে হবে? আজ ত রোববার নয়

তখন মাঝে মাঝে রবিবার সকালবেলা তারা তুজনে ছবি দেখতে যেত বটে।

অত কথার দরকার কি? চলই না। দেখতেই ত পাবে কোথায় নিয়ে যাই। অনুপম জেদ করেছে এবার।

অনুপমের জেদটা তার চরিত্রের পক্ষে অস্বাভাবিকই মনে হয়েছে শোভনার। ভালো লেগেছে অনুপমের এই পীড়াপীড়ি, তবু একটু ওজর তুলেছে অনুপমের আরো একটু সাধাসাধিই যেন উপভোগ করবার জন্যে। বলেছে, কিন্তু এখন বেরুলে ঘরসংসারের কাজগুলো কি করে হবে শুনি? আজ কি হরিমটর নাকি?

হ্যাঁ, তাই। দোহাই, আর দেরি করো না। অনুপম সত্যি কাতর হয়েছে।

অনুপম তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাচ্ছে দেখাতে এটা সত্যিই শোভনা ভাবতে পারে নি।

ডাক্তার পরীক্ষা করে ভয়ের কথা কিছু বলেন নি। অন্ততঃ তার সামনে নয়।

শোভনার ডাক্তারের কাছে আসার পর বেশ একটু ভয়ই হয়েছিল। নিজের মনে যে সন্দেহ তার কিছুদিন ধরে উঁকি দিচ্ছে তাই সত্য বলে প্রমাণ হবার ভয়। খুব খারাপই লেগেছিল ডাক্তারকে দিয়ে পরীক্ষা করাতে। এর চেয়ে সংশয়ের অন্ধকারে থাকাই যেন ভাল ছিল।

কিন্তু ঠিক উল্টো মনের ভাব হয়েছে ডাক্তারের সামান্য একটু সহাস্য আশ্বাসে। সংশয় কেটে গিয়ে একটা অতিরিক্ত নিশ্চিন্ততা এসেছে নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে।

ডাক্তার মুখে তাকে বলেছেন, কিছু ভাবনার নেই। তু'দিনে সুস্থ হয়ে উঠবেন। ক'দিন শুধু একটু সাবধানে থাকতে হবে।

সুস্থ হয়ে ওঠার বিশ্বাসে সে সাবধান থাকাটা পর্যন্ত অবহেলা করেছে। নিজের মনের গোপন আশঙ্কাকে অস্বীকার করবার আগ্রহেই

যেন এই অতিরিক্ত তাচ্ছিল্য। ডাক্তার যে ওষুধ দিয়েছিলেন, তু'দিন খেয়ে আর খায় নি। বলেছিলেন বুঝি রক্ত পরীক্ষার কথা অনুপমকে। ওসব বড়লোকের জন্যে, বলে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে।

তার পর মাঝরাত্রে সেদিন কাশতে কাশতে ঘুম থেকে উঠে বসে সেই সমস্ত শরীর অবশ করে দেওয়া আবিষ্কার! কাশি চাপতে মুখে আঁচলটাই চাপা দিয়েছিল। আঁচলটা সরিয়ে নেবার পর তাতে যেন কিসের দাগ!

ঘরের কোণে পলতে নামিয়ে-রাখা হ্যারিকেনের মিটমিটে আলোয় দাগটা ভাল করে দেখা যায় নি। কিন্তু শোভনার বুঝতে যেন কিছু আর বাকি থাকে নি।

অনুপম পাশের বিছানায় অঘোরে ঘুমোচ্ছে। শোভনা সন্তর্পণে বিছানা থেকে নেমেছে। নামতে গিয়ে ভেতরের আতঙ্কে শরীর-মনের কেমন একটা অবশতায় টলে পড়েছে পাশের জলের কুঁজো-রাখা চৌকিটার ওপর। কুঁজোটা পড়ে নি। ধরে ফেলেছিল সময় মত। কিন্তু গেলাসটা ঠন্ ঠন্ করে বেজে উঠেছিল। শোভনা সভয়ে তাকিয়েছিল অনুপমের দিকে। অনুপম জাগে নি।

শোভনা ধীরে ধীরে হ্যারিকেনটা নিয়ে পাশের ছোট ভাঁড়ার ঘরটায় গিয়ে পলতেটা তুলে দিয়ে আঁচলটা ভাল করে দেখেছিল।

দেখে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল বুকের ভেতরটা একটা হিম-শীতল ধারার স্পর্শে। আর সন্দেহের কোন অবকাশ নেই তখন।

কতক্ষণ যে নিস্পন্দ আচ্ছন্ন হয়ে বসে ছিল মনে নেই। নিস্পদ শুধু দেহে, মনে তখন তার সব কিছু ওলট-পালট করা ঝড় চলেছে।

সেই রাত্রেই সে প্রথম মৃত্যুকে উপলব্ধি করেছিল তার জীবনে, মৃত্যুকে তার অর্থহীন বিচারহীন নিষ্ঠুরতার দিক্ থেকেই চিনেছিল নিজের হৃদয়-বিদীর্ণ-করা তীব্র জ্বালাময় বিদ্যুৎছটায়।

সে যন্ত্রণা যেন এখনও স্মরণ করলে অসহ্য মনে হয়। শোভনা মনটাকে জোর করে বর্তমানে ফিরিয়ে আনল।

রান্না মোটামুটি হয়ে গেছে। এখন আশুবাবু ফিরে এলেই তাঁর জন্যে ভাতটুকু ফুটিয়ে নিতে পারে।

আশুবাবু তাঁর বহুদিনের অভ্যাসের ব্যতিক্রম করে রাত্রে মিষ্টি ফলমূলের বদলে ভাত খাবেন বলে গেছেন। এ ব্যতিক্রম তারই জন্যে,—শোভনা বোঝে। আর সেই জন্যেই তার আরো অস্বস্তি। যত নিঃস্বার্থ উদারতা এ ব্যতিক্রমের পেছনে থাক না কেন, যার জন্যে এ ব্যতিক্রম, তাকে কিছু দাম এর জন্যে দিতে হয়ই। কি সে দাম?

সাত

দিন কয়েক এমনি করেই গেল।

কতকটা যেন ছকবাঁধা রাস্তায় জীবনটা ফেলবার চেষ্টা। সব কিছু অল্পবিস্তর ঘড়ি-ধরা নিয়মের আবর্তন।

সকালে উঠে নিজের ঘর-দোরের যৎসামান্য কাজকর্ম সেরেই আশুবাবুর হেঁসেলে গিয়ে লাগা। দুপুরে ও রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিজের ঘরের নির্জনতা আছে বটে, কিন্তু বাকিটা আশুবাবুর হেঁসেল ও সংসারের ছন্দেই বাঁধা।

আশুবাবু সেখানে অবশ্য অবাধ কর্তৃত্ব দিয়ে রেখেছেন, স্বাধীন ভাবে নিজের ইচ্ছামত কাজ করা সুবিধে। আশুবাবুর সংসার চালাবার ভারও তার উপরই ক্রমশঃ যেন এসে পড়ছে। শুধু হেঁসেল নয়, অন্য সব-কিছুও দেখাশোনা করবার দায়িত্ব।

এ দায়িত্ব ধীরে ধীরে নিঃশব্দে চাপাবার ধরন যদি আশুবাবু সচেতন ভাবে উদ্ভাবন করে থাকেন তাহলে তাঁকে বিচক্ষণ বলতে হয়।

একটু একটু করে কর্তৃত্ব যে তার হাতে জমছে তা শোভনাকে যেন টের পেতেই দেওয়া হয় নি।

হেঁসেলের কাজ শেষ হবার পর মধু হয়ত বলেছে, আজ মুদিখানার

ফর্দ করে দিতে হবে দিদিমণি। বাবু বলেছেন এখন থেকে মাসকাবারী সওদা আসবে।

আশুবাবু নিজেই হয়ত খেতে বসে বলেছেন এক সময়ে, বালিশ-বিছানাগুলোর সব বড় দুর্দশা হয়েছে! আমার সঙ্গে আজ একবার যাবে মা দোকানে? বালিশের ওয়াড়, বিছানার চাদর, এই সব তাহলে বছরখানেকের মত কিনে নিশ্চিন্ত হই।

ট্রাম রাস্তার দোকান-পাড়ায় আশুবাবুর সঙ্গে যেতে হয়েছে তারপর। বাসে বড় ভিড়। আশুবাবু রিক্‌শতে করেই নিয়ে গেছেন।

যেতে যেতে নানান বিষয়ে কথা বলেছেন। ব্যক্তিগত ভাবে নিজের বা শোভনার কোন প্রসঙ্গ তোলেন নি, তবে তাঁর নিজের আত্মীয়-স্থানীয়া একটি মেয়ের যে কাহিনী কথায় কথায় বলেছেন, তাতেই তাঁর মনে শোভনার বিষয়ে কতখানি দুশ্চিন্তা আছে তা বোঝা গেছে।

কাহিনীটা এমন কিছু নয়। একটি মেয়ে দুটি শিশু সন্তান নিয়ে অকালে বিধবা হয়ে কেমন করে নিজের চেষ্টায় ও সঙ্কল্পের দৃঢ়তায় নিজের জীবন ও চরিত্র নিষ্কলুষ রেখে সেই সন্তানদের মানুষ করে তোলে তারই ইতিহাস।

মামুলী হলেও এই ইতিহাসের মধ্যে প্রেরণা পাবার নিশ্চয়ই কিছু আছে।

আশুবাবু অন্ততঃ তা মনে করেন। এই কয়দিনেই তাঁর কাছে এ ধরনের দৃষ্টান্তের কথা কয়েকবার শোভনাকে শুনতে হয়েছে।

প্রত্যেকটি দৃষ্টান্তেই একটা জিনিস বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয়। ভাগ্যবিড়ম্বিত মেয়েগুলির চরিত্রবল। ভাগ্যের কোন আঘাতেই তারা নিজেদের এই সম্পদটি হারায় নি। চরম দুর্যোগ ও দুর্দশার মধ্যে তারা তাই চরিত্রের তেজেই দীপ্ত হয়ে আছে।

শোভনা নীরবেই এ-সব কথা শুনেছে। সেও যেমন কোন

মন্তব্য করে নি, আশুবাবুও তেমনি কাহিনীটুকু বলেই অন্য প্রসঙ্গে চলে গেছেন।

দোকানে গিয়ে আশুবাবু বালিশের ওয়াড়, বিছানার চাদর ছাড়া আরো বেশী কিছু কিনেছেন। নিজের ধুতি ও জামার কাপড়ের সঙ্গে দুটি শাড়ী যখন পছন্দ করতে বলেছেন, শোভনা তখন ইচ্ছে করেই কোন আপত্তি জানায় নি। দোকানের লোকজনের ভিড়ের মাঝখানে আপত্তি জানানটা অশোভন লেগেছে বলেই বোধ হয়।

ফেরবার পথে আশুবাবুই তার অনুক্ত আপত্তি নিজে থেকে খণ্ডন করেছেন অপ্রাসঙ্গিক ভাবে।

হঠাৎ বলেছেন গম্ভীর ভাবে, তুমি শাড়ী জোড়া কিনে দেওয়ায় হয়ত ক্ষুণ্ণ হয়েছ মা। কিন্তু তাহলে চলবে না। তোমার শাড়ী কেন, আরো অনেক কিছুর প্রয়োজন। এ-সব প্রয়োজনের জিনিস আমার কাছে বিনা প্রতিবাদেই তোমায় নিতে হবে। এটাকে দয়ার দান মনে করো না, তাহলেই লজ্জার বা গ্লানির কিছু থাকবে না।

শোভনা অবশ্য বলতে পারত, দয়ার দান ছাড়া কি মনে করব?

কিন্তু কিছুই সে বলে নি। কৃতজ্ঞতায় গদ্‌গদ হতে যেমন পারে নি, তেমনি আপত্তি জানিয়ে এই সহৃদয় বৃদ্ধকে সামান্য একটু আঘাত দিতেও তার বেধেছে।

কিন্তু মনে মনে তখনই সে সঙ্কল্প করেছে, সব সমস্যার এই প্রায় অলৌকিক সমাধানের উপায় সে বেশী দিন আঁকড়ে ধরে থাকবে না।

সেই সঙ্কল্প নিয়েই কয়েকদিন বাদে সকালের রান্নাবান্না খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল দুপুরবেলায়।

আশুবাবু তখন একটু বিশ্রাম করছেন তাঁর ঘরে। তাঁকে কিছু না জানিয়েই তাই যাওয়া সম্ভব হল।

তিনি জানতে পারলে বাধা বোধ হয় দিতেন না। কিন্তু কোথায় যাচ্ছে সে প্রশ্ন হয়ত করতেন।

অনাবশ্যক কৌতূহল বা অভিভাবকত্ব প্রকাশ না করলেও কদিন থেকে তিনি আগের তুলনায় ব্যক্তিগত প্রশ্ন দুটো-একটা করতে সুরু করেছেন, শোভনা লক্ষ্য করেছে। এটা তাঁর স্নেহেরই পরিচয় সন্দেহ নেই। সে স্নেহের আন্তরিকতাই তাঁকে ওটুকু অধিকার দিয়েছে।

তবু শোভনার পক্ষে সেটা অস্বস্তিকর।

বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন সম্বন্ধে সে রকম কোন প্রশ্ন করলে, শোভনা মিথ্যা কিছু বলতে পারত না। কিন্তু সত্য কথা বলাটা উভয়ের পক্ষেই অপ্রীতিকর হত।

শহরের বড় রাস্তা পর্যন্ত নির্বিঘ্নে হেঁটে এসে তাই শোভনা একটু নিশ্চিন্তই হল। এই রাস্তাটুকুর মধ্যে মধু বা আর কারুর সঙ্গে দেখা হয় নি বলেই আরো নিশ্চিন্ত।

শোভনা আজ খেয়াল-খুশি মত ঘোরবার জন্য বেরোয় নি। মনে মনে একটি নির্দিষ্ট গন্তব্য ঠিক করেই রওনা হয়েছে। নির্দিষ্ট গন্তব্য আর উদ্দেশ্য।

কদিন ধরে অনেক ভেবে-চিন্তে এই ঠিকানাতেই প্রথম যাওয়ার কথা সে স্থির করেছে।

ঠিকানাটা শহরের প্রায় অপর প্রান্তে। আদি কলকাতার পুরাতন অপেক্ষাকৃত দরিদ্র পাড়ায়।

বাস থেকে নেমে শোভনা যখন গলিটার মুখে গিয়ে পৌঁছায় তখন বেলা মাত্র একটা।

এই অবেলায় কারুর বাড়ী গিয়ে ওঠা হয়ত শোভন নয়, বিশেষ করে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানের পর যদি এ যাওয়া হয়। কিন্তু শোভনা নিরুপায়। এই দুপুর-বেলাটি ছাড়া তার অবসর আর নেই। বিকেলের মধ্যে না পারুক, সন্ধ্যের আগে তাকে ফিরতেই হবে। ট্রাম-বাসের

এই ভিড়ের সময় শহরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে তখন সময় মত পৌঁছোবার ভরসা করা যায় না। দেরি করে এলে আশুবাবু মনেও যদি কিছু করেন, মুখে নিশ্চয়ই কিছু বলবেন না। কিন্তু শোভনা তার নিজের আচরণে যৎসামান্য ত্রুটিটুকুও রাখতে চায় না; আশুবাবুর দিক থেকে যদি অহেতুক স্নেহ হয়, তার দিক থেকেও থাকবে কঠিন কর্তব্যপরায়ণতা, যা হিসেব করা মূল্য দেওয়া-নেওয়ার উর্ধ্বে।

সঙ্কোচ ও দ্বিধা নিয়েই তাই দুপুরবেলাতেই তাকে আসতে হয়েছে।

বাড়িটা চিনতে অবশ্য কোন অসুবিধাই হয় না। পাড়াটার চেহারা এই ক'বছরেই কিছু বদলেছে। কিন্তু এ বাড়িটার প্রাধান্য এখনও নতুন কোন ইমারৎ খর্ব করতে পারে নি।

বাড়িটা এখনও যেন ঠিক সেই প্রথম দেখার দিনের চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোন পরিবর্তন তাকে স্পর্শ করতে পারে নি। সেই ছবির মত সদ্য যেন রঙ্-করা ঝকঝকে চেহারা। গেটে সেই দরোয়ান। দোতলা পর্যন্ত সেই লতানে ফুলের বাহার।

গেট দিয়ে ঢোকবার সময় দরোয়ান একবার ভ্রূকুটি করেছিল মাত্র, কিন্তু বাধা দেয় নি। বাধা দোতলার সেই বারান্দা দিয়ে চেনা ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ানো পর্যন্ত কোথাও পায় নি। পেল একেবারে দরজার সামনেই।

দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। টোকা দিয়ে ডাকবে কি না ভাবছে এমন সময়ে একটি বর্ষীয়সী ঝি এসে আপাদমস্তক একবার ভাল করে দেখে নিয়ে একটু রূঢ় ভাবেই জিজ্ঞাসা করলে, কাকে চাই বাছা?

সম্বোধনটা সম্মানের নয়। তবু তা গায়ে মাখলে এখন চলে না। শোভনা হেসে কার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে জানাল। প্রথমে দুখী বৌ নামটা একেবারে জিভের ডগায় এসে গেছল। অতি কষ্টে সামলেছে।

তোমাদের গিন্নি মা'র সঙ্গে দেখা করতে চাই, বলাতেও তেমন কোন ফল হল না। ঝি একটু অপ্রসন্ন মুখেই বললে, তিনি ত এখন কারুর সঙ্গে দেখা করেন না। বিকেলবেলা এসো।

শোভনার এই ঝির কাছে বহুদূর থেকে এসেছে বলে দেখা করবার জন্যে অনুনয়-বিনয় জানাতে প্রবৃত্তি হল না। সে একটু শুষ্ক স্বরেই বললে, বিকেলে আসা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি অনেক দূরে থাকি। তোমার মাকে বলো, এ পাড়ায় যে শোভা বৌ থাকত সে দেখা করতে এসেছিল। কথাগুলো বলে শোভনা ফিরেই যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ ভেতর থেকে ছিটকিনি খোলার শব্দ পাওয়া গেল।

দরজা খুলে এবার যে বেরিয়ে এল তাকে দেখে শোভনা অবাক্।

এই কি সেদিনের সেই দুখী বৌ, যার নামটা হিংসে করেই কেউ দিয়েছে বলে সেদিন সন্দেহ করা স্বাভাবিক ছিল!

দুখী বৌ-এর সাজ-পোশাক থেকে চেহারায় আচরণে তখন অন্ততঃ দুঃখের কোন চিহ্ন আবিষ্কার করা যায় নি।

এ দুখী বৌ কিন্তু স্পষ্টই যেন দুঃখের প্রতিমূর্তি।

সাজ-পোশাক গয়না সবই আছে এখনো। কিন্তু আসল মানুষটার সমস্ত বাইরের আবরণ ভেদ করে অন্তরের ব্যথিত দীন চেহারাটা যেন আর লুকানো যাচ্ছে না।

দুখী বৌও শোভনাকে চিনতে না পেরেই বোধ হয় খানিকক্ষণ নীরবে তার দিকে তাকিয়ে ছিল, তার পর হঠাৎ উচ্ছ্বসিত আনন্দে এসে তার দুটি হাত ধরে নিজের ঘরে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বললে, তুমি আসবে আমি ভাবতেই পারি নি, ভাই। ভাগ্যিস্ আমি বাইরে ঝির সঙ্গে তোমার কথাবার্তা শুনে দরজাটা খুললাম, নইলে তুমি নিশ্চয় অভিমান করে চলে যেতে। আমি জানতেও পারতাম না।

শোভনা এই উচ্ছ্বসিত অভ্যর্থনার ধরন সত্যিই আশা করে নি। দুখী বৌ-এর সঙ্গে তার ভাব হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু সেটা নিবিড় অন্তরঙ্গতায় পৌঁছয় নি কোনদিনই।

আজকের এই অভ্যর্থনার আকুলতার মধ্যে তুখী বৌ-এর নিজের করুণ নিঃসঙ্গতাই কি ফুটে উঠছে?

শোভনাকে নিয়ে গিয়ে ঘরের ভেতর বসিয়ে কথা বলবার ধরনে তাই মনে হল।

তুখী বৌ তখনও সহজ ভাবেই আন্তরিকতার সঙ্গে আলাপ করত, কিন্তু কোথায় যেন নিজেকে রাশ টেনে ধরে রাখছে বলে মনে হত। সেই রাশটাই যেন আজ নেই।

তুখী বৌ-এর বুকের মধ্যে যেন কথার স্রোত রুদ্ধ হয়ে ছিল। শোভনাকে পেয়ে সেই রুদ্ধ স্রোত হঠাৎ ছাড়া পেয়েছে।

তুখী বৌ এক নিঃশ্বাসে যত কথা বলে গেল, প্রশ্নও করে গেল তার মধ্যে তত।

কি ভাগ্যি, সে সব প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করার ধৈর্য তার নেই। নইলে শোভনা অসুবিধাতেই পড়ত।

প্রশ্ন তার অজস্র ও বিচিত্র। শোভনারা এ বাড়ি ছেড়ে উঠে গেল কেন? শোভনার ছেলেপুলে হয়েছে কি না? এতদিন একবার দেখা করতে আসে নি কেন? আসার অসুবিধা থাকলে একটা চিঠিও ত দিতে পারত। তা দেয় নি কেন? এখন কোন্ পাড়ায় তারা আছে? শোভনার স্বামী এখন কি কাজ করে? শোভনা এত রোগা হয়ে গেছে কেন?

শোভনা সুবিধে মত কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিলে, কয়েকটার দিলে না।

এই উচ্ছ্বসিত আলাপের মধ্যে নিজের বক্তব্যটা কি ভাবে যে জানাবে তা ঠিক করে উঠতে পারল না শেষ পর্যন্ত।

তুখী বৌ আদর-যত্ন আপ্যায়নের ত্রুটি রাখলে না কোন দিক্ দিয়ে।

বিকেলেই চলে যেতে হবে জেনে জোর করে চা-জলখাবার খাওয়ালে অসময়ে। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাড়িটার নতুন কি কি পরিবর্তন

হয়েছে তা দেখালে। মাঝে কিছুদিনের জন্যে যেখানে বেড়াতে গেছল সেই দক্ষিণ-ভারতের ভ্রমণ-কাহিনী সবিস্তারে বলে সেখানে তোলা সব ছবির অ্যাল্‌বাম্ এনে সামনে ধরলে। যতক্ষণ শোভনা সেখানে রইল, সমস্তক্ষণই কথার স্রোত বইয়ে রাখলে তুথী বৌ। শোভনার মনে হল, এ কথার স্রোত থামলেই কোন এক মরুরুক্ষ হৃদয়ের চড়া ঠেলে বেরিয়ে পড়বে, এই যেন তুথী বৌ-এর ভয়।

বিদায় নিয়ে ফিরে যাবার সময় শোভনা নিজের কথাটা বলবার একটু বুঝি সুযোগ পেল। কিন্তু সে সুযোগ আর নেওয়া হল না।

সিঁড়ি দিয়ে নিচে পর্যন্ত তুথী বৌ তাকে এগিয়ে দিতে নামছিল। ছেঁড়া ময়লা থান-পরা একটি প্রৌঢ়া সিঁড়ির নিচে তুথী বৌ-এর অপেক্ষাতেই দাঁড়িয়ে আছে দেখা গেল।

প্রৌঢ়া তুথী বৌ নামবার সঙ্গে সঙ্গে গদ্‌গদ ভাষায় যা জানাল তাতে বোঝা গেল, তুথী বৌ-এর কথায় তার স্বামী প্রৌঢ়ার একটি ছেলের কোথায় একটা চাকরি করে দিয়েছেন। প্রৌঢ়া সেই জন্যেই কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছে।

তুথী বৌ একটু অস্বস্তির সঙ্গে সে কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস যথাসাধ্য তাড়াতাড়ি থামিয়ে শোফারকে গাড়ি বার করতে বললে।

গাড়ি যে তার জন্যেই ডাকা হতে পারে, শোভনার তা কল্পনাতীত। কৃতজ্ঞ প্রৌঢ়া চলে যাবার পর একবার মনে হল, তার কথাটাও এই সময়ে বলে ফেলা যায়।

কিন্তু তখন শোফার এসে সেলাম করে কাছে দাঁড়িয়েছে আর তুথী বৌ শোভনাকে তার বাড়ি পর্যন্ত পেঁৗছে দিয়ে আসার জন্যে হুকুম দিচ্ছে।

একদিকে বিস্ময়ে বিহ্বলতায়, আর-একদিকে নিজেরই কুণ্ঠায় আসল কথা কিছুই শোভনার বলা হল না।

শুধু একটু মৃদু প্রতিবাদ সে জানাতে পারলে, গাড়ি আবার কেন?

নয় কেন ভাই! বিকেলে গাড়িটা ত বসেই থাকে। তোমার নতুন বাসাটা বরং রামসেবক চিনে আসুক।

শোভনা এর পর নীরবেই গাড়িতে উঠে বসল। তার নতুন বাসাটা যে রামসেবকের মত খানদানী ড্রাইভারকে দেখাবার নয় তা আর কি করে সে বোঝাবে।

রামসেবককে গাড়ি নিয়ে শোভনার বাসা পর্যন্ত সেদিন যেতে হল না। দরকারের অছিলায় বড় একটা বাজারের কাছেই নেমে শোভনা তাকে বিদায় দিলে।

সেখান থেকে অত্যন্ত ঠাসাঠাসি ভিড়ের একটি বাসে বাসায় ফিরতে ফিরতে শোভনার মনে হল নিজের ব্যর্থ অভিযানের হতাশার চেয়ে দুখী বৌ-এর সব থেকেও কিছু না থাকার বেদনার রহস্য যেন বড় হয়ে উঠেছে।

আট

বাস্ থেকে নেমে হাঁটাপথে আঁকাবাঁকা গলি দিয়ে শোভনা একটু দ্রুতপদেই হাঁটছিল। ফিরতে একটু বেশী দেরি হয়ে গেছে। রাত্রের রান্নার কাজ ত আছেই, তা ছাড়া আশুবাবু নিশ্চয় ব্যস্ত হয়ে থাকবেন।

আশুবাবুর তার জন্যে এই ব্যস্ত হওয়াটাই অস্বস্তিকর হয়ে উঠছে বুঝতে পেরে শোভনার নিজেকে একটু অপরাধীই মনে হয় অবশ্য। যথেষ্ট কৃতজ্ঞতার অভাবটা তার নিজেরই চরিত্রের ত্রুটি ভেবে মনকে সে শাসন করবার চেষ্টা করে না এমন নয়। কিন্তু সে শাসনে কোন ফল হয় বলে মনে হয় না। আশুবাবু প্রতিদিন নতুন কি স্নেহের পরিচয় দেবেন এইটেই যেন তার মনের নাতিস্ফুট একটা আতঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে, একথা সে অস্বীকার করতে পারে না।

দুপুরে বেরিয়ে আসবার সময় আশুবাবুকে জানিয়ে আসবার

দরকার হয় নি। তিনি তখন বিশ্রাম করছিলেন। সময়মত বেলাবেলি ফিরতে পারলে কোনরকম জবাবদিহির দায়ে পড়তে হত না। এখন আর তার নিষ্কৃতি বোধ হয় নেই। আশুবাবু বাড়ীর বাইরেই পায়চারি করছেন কি না কে জানে! কোথায় গিয়েছিল জিজ্ঞাসা করলে শোভনা অবশ্য অর্ধসত্য বলবার জন্যেই তখন প্রস্তুত। পুরনো এক বন্ধুর বাড়ী গিয়েছিল এইটুকুই জানাবে। আশা করা যায় তার বেশী কৌতূহল এর পর আর আশুবাবু প্রকাশ করবেন না।

তার সম্বন্ধে আশুবাবুর ব্যস্ততা কেন যে খারাপ লাগে, শোভনা অবশ্য মনে মনে বোঝে। এটা আশুবাবুর বিষয়ে ব্যক্তিগত কিছু বিরূপতা নয়। আসল কথা, স্নেহ, মায়া, প্রেম, যা কিছুই সে জীবনে পেয়ে থাক তার জন্যে কোন বন্ধন সে অনুভব করে নি এর আগে। স্নেহ-প্রীতির হলেও কোন শাসন তাকে স্বীকার করতে হয় নি কখনও, স্বীকার সে করেও নি। চিরকালই স্বাধীনতা তার অক্ষুণ্ণ। মা'র ত এ ধরনের রাশ বলে কিছু ছিলই না, বড় মামা কয়েকদিন চেষ্টা করেও হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। আর অনুপম? অনুপমের ত শাসনের কোন দাবীই ছিল না কোনদিন। শোভনাকে সে কোন বন্ধনে কখনও বাঁধবার চেষ্টা করে নি। নিজেই সে অসংলগ্ন ছিল বলে কি? তার উদারতা এখন ঔদাসীন্য বলে সন্দেহ হয়।

এত দুর্ভাবনা তার বৃথা, আশুবাবুর কাছে কোন জবাবদিহি দেওয়ার আজ দরকার হল না। আশুবাবু বাড়িতে নেই। কে একজন আগন্তুক এসে তাঁকে কোথায় ডেকে নিয়ে গেছে। তাঁর বদলে নিখিল বক্সী তার অপেক্ষায় পায়চারি করছে তারই ঘরের সামনে উঠোনে।

এই এতক্ষণে এলেন? কতক্ষণ আমায় দাঁড় করিয়ে রেখেছেন জানেন? নিখিলের কণ্ঠস্বরে অভিযোগ।

ঘরের দরজার তালাটা খুলতে খুলতে শোভনা একটু শুষ্কস্বরেই

বললে, আপনার দাঁড়াবার কথা ছিল তা ত জানতাম না। জানলে নিশ্চয় এমন অপরাধ করতাম না।

এ বিদ্রূপের খোঁচা নিখিল বক্সীর কাছে ব্যর্থ। শোভনা দরজা খুলে ভেতরে ঢোকবার সঙ্গে নির্বিকার ভাবে সেও ভেতরে এসে বললে, সোজা কথা অমন উল্টো করে ধরেন কেন বলুন ত! সন্ধ্যে হয়ে এল তবু ফিরছেন না দেখে ভাবছিলাম। অথচ আপনাকে এগুলো না দিয়েও যেতে পারছি না।

কি ওগুলো? নিখিলের হাতের কাগজগুলোর দিকে দৃষ্টি দিয়ে শোভনা যথাসম্ভব নিরুৎসুক ভাবেই জিজ্ঞাসা করলে।

পড়েই দেখবেন'খন। কাগজগুলো শোভনার হাতে প্রায় জোর করে গুঁজে দিয়ে নিখিল ব্যস্ত হয়ে বললে, আমার এখন বুঝিয়ে বলবার সময় নেই। একটা ঠিকের চাকরি আজ আবার জুটে গেছে কি না! যা দেরি করিয়ে দিলেন, চাকরি না হতেই হয়ত গিয়ে দেখব দরজা বন্ধ।

দেরি তাহলে করলেন কেন? শোভনা এবার না হেসে পারল না,—এগুলো ত পরে দিলেই পারতেন! আর না দিলেই বা কি হত!

বাঃ, না দিলে কি হত! আপনার জন্যে কত করে সংগ্রহ করেছি তা জানেন?

নিখিল বক্সী শোভনার অবিবেচনায় দারুণ ক্ষুণ্ন হয়ে আরও কিছু হয়ত বলত, কিন্তু শোভনাই তাকে বাধা দিয়ে হেসে বললে, থাক, এখন আর কিছু জানতে চাই না। আপনার চাকরিটা আগে সামলান গিয়ে।

হ্যাঁ, যা বলেছেন! দরজার চৌকাঠটা পেরিয়েই আবার নিখিল ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, কিন্তু মজা কি জানেন, দেরি করি আর নাই করি, সত্যি সত্যি এ চাকরি যাওয়া শক্ত। আমার যত গরজ, মনিবের গরজ তার চেয়ে কম নয়। সুতরাং মুখে যাই বলি, চাকরির জন্যে ভাবনা নেই।

আপনার না থাক আমার আছে। শোভনা এবার দরজার পাল্লা দুটো ধরে বন্ধ করতে করতে হেসে বললে, দেরি হয়ে গেছে এমনিতেই। আপনি যান।

হ্যাঁ হ্যাঁ, যাচ্ছি ত। কাগজগুলো কিন্তু পড়বেন।

নিখিলের শেষ কথাগুলো দরজা বন্ধর শব্দেই হয়ত চাপা পড়ল।

নিখিলকে তাচ্ছিল্য কি অবজ্ঞা করবার জন্যে শোভনা তার মুখের ওপর অমন করে দরজা বন্ধ করে নি। নিখিলকে বিদায় করা প্রয়োজন ত বটেই, তা ছাড়া সত্যিই তখন তার নিজেরই তাড়া। কাপড় ছেড়ে তাড়াতাড়ি হেঁসেলে না গেলে নয়। বাড়ি ঢোকার পথে মধুর কাছে শুনে এসেছে যে আশুবাবুকে কে একজন অচেনা লোক খুঁজতে এসেছিল। তার সঙ্গেই তিনি বেরিয়ে গেছেন। এতক্ষণে ফিরে এসেছেন কি না কে জানে! মধুকে দিয়ে ডাকতে পাঠাবার আগেই সে তাই যেতে চায়।

বাইরের কাপড় ছেড়ে ঘর থেকে বেরুবার মুখে বিছানার ওপর রাখা নিখিলের দেওয়া কাগজগুলোর ওপর একবার চোখ পড়ল। ব্যাপারটা কি জানবার একটু কৌতূহল না হল এমন নয়। কিন্তু সময় নেই। তা ছাড়া নিখিল বক্সীকে যতটুকু চিনেছে তাতে তার কোন কথায় বা কাজে খুব গুরুত্ব দেবার দরকার আছে বলে মনে হয় না। বিছানার উপর থেকে কাগজগুলো তুলে একটা বালিশের তলায় চাপা দিয়ে রেখে সে ঘর বন্ধ করে বেরিয়ে গেল।

আশুবাবু তখনও ফেরেন নি এই ভাগ্যি। শোভনা নিশ্চিন্ত হয়েই রান্নাবান্নার কাজে লাগল। কিন্তু রান্নাবান্নার কাজ শেষ করবার পরেও আশুবাবুকে ফিরতে না দেখে নিশ্চিন্ততার বদলে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল একটু। আশুবাবু ত সন্ধ্যের দিকে ঘর থেকে বারই হন না। এত রাত পর্যন্ত বাইরে থাকা তাঁর পক্ষে অত্যন্ত অস্বাভাবিক।

রান্না শেষ করে শোভনা আশুবাবুর অপেক্ষায় তাঁর ঘরেই এসে বসেছিল। পুরনো কালের দেওয়াল-ঘড়িটায় আশুবাবুর মতই

হাঁপানি কাশি-ধরা গলায় টানা সুরে একটা ঘণ্টা বাজতে সে চমকে উঠল। সাড়ে নটা বেজে গেল তা হলে! বৃদ্ধ হাঁপানি রোগী। আশুবাবুর রাস্তায় কোন বিপদ্-আপদ্ হয় নি ত? নইলে এত দেরি করার কি কারণ থাকতে পারে?

কিছুই অবশ্য এখুনি তার করবার নেই। আশুবাবু কোথায় কি কাজে গেছেন কিছুই জানে না। জানলেই কিছু করা কি তার পক্ষে সম্ভব?

ব্যাপারটা হয়ত এমন কিছুই গুরুতর নয়। আশুবাবুর পক্ষে এত রাত পর্যন্ত বাইরে থাকা তাঁর সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম বটে, কিন্তু এমন ব্যতিক্রম অসম্ভব কিছু নয়। কোথাও কোন কারণে বোধ হয় আটকে পড়েছেন অপ্রত্যাশিত ভাবে। খানিক বাদেই ফিরবেন।

নিজের মনের এই ভাবনাগুলোই বিচার করে দেখবার মত বলে হঠাৎ তার মনে হয়। আশুবাবু সম্বন্ধে এই উদ্বেগের মধ্যে সাধারণ শ্রদ্ধা-প্রীতি-কৃতজ্ঞতার প্রকাশ ছাড়া আর কি কিছু নেই? আশুবাবুর নিরাপদ থাকার সঙ্গে জড়িত নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অস্ফুট অনিশ্চিত একটা আশঙ্কা? তার গ্রাসাচ্ছাদনের আশু সমস্যা এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে মিটেছে বলে সচেতন মন তার হয়ত একটু ক্ষুব্ধ, আশুবাবুর অহেতুক অনার্জিত স্নেহ গ্রহণ করতে বাধ্য হওয়ার জন্যে কোথায় তার একটা অস্বস্তি, কিন্তু এ সবের অন্তরালে অচেতন মনের একটা নির্ভরতা কি গড়ে ওঠে নি ইতিমধ্যে?

আশুবাবুর কিছু একটা হলে আবার একমুহূর্তে সে নিরাশ্রয়, নিঃসম্বল, এই চিন্তাটাই মনের গভীরে তাকে দোলা দিচ্ছে, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

আশুবাবু সত্যিই বৃদ্ধ হয়েছেন। কিছুই হয়ত তাঁর হয় নি আজ। কিন্তু হওয়া অসম্ভব এমন ত নয়!

মৃত্যুর অতর্কিত অপ্রত্যাশিত পদক্ষেপের পরিচয় সে ত আগেও পেয়েছে। পেয়েছে সেই তার বড় মামার বেলা। তার পর মায়ের।

মায়ের মৃত্যুটাই সেদিন সবচেয়ে বিহ্বল বিমূঢ় করে দিয়েছিল।

শুধু দুঃখে-শোকে নয়, একটা যুক্তিহীন আশঙ্কায়। চরম সহায়-হীনতার একটা স্তম্ভিত উপলব্ধিতে।

আজ তার মনের অতলে তেমনি একটা অনুভূতিই যেন উঁকি দিচ্ছে।

সে নিজে তখন মৃত্যুর সঙ্গে যুঝছে। দুরন্ত রোগের সব লক্ষণই তখন ধরা পড়েছে। চিকিৎসা চলছে তাদের ওই অবস্থায় যতদিন সম্ভব।

তারই মধ্যে মাকে হারাবার সেই আকস্মিক দুঃসহ আঘাত।

অনুপমকে বিয়ে করে আলাদা সংসার পাতবার পর অনেক অনুরোধ-উপরোধ করেও মাকে সে তাদের সংসারে এসে থাকতে রাজি করাতে পারে নি। মা সেই পুরনো বাসাতেই একটি ঘর নিয়ে একা থাকতেন। তাঁকে সাহায্য করবার ক্ষমতা শোভনাদের ছিল না, থাকলেও তিনি সে সাহায্য নিতেন না শোভনা জানত।

কি করে যে তিনি দিন চালাতেন তিনিই জানেন। শোভনা ইচ্ছে করেই সে কথা কখনও জিজ্ঞাসা করে নি। জিজ্ঞাসা করে নি মার চরিত্র তার অজানা নয় বলে।

হাজার অনুরোধেও যাঁকে তাঁর একা থাকার সঙ্কল্প থেকে নড়ানো যায় নি, তিনি কিন্তু শোভনার অসুখের খবর পাবার পর নিজে থেকেই তাদের সংসারে এসে উঠেছিলেন শোভনাকে শুশ্রূষার জন্যে।

শোভনা তখন শয্যাশায়ী। এমনিতেই অনুপম অসহায়, অপটু। শোভনার এই সর্বনাশা অসুখে সে যেন আরও দিশাহারা জড়ভরত হয়ে গেছে।

মার সেই আশ্চর্য আর এক রূপ সেদিন দেখেছে শোভনা।

রীতিমত অভাবের সংসার। কিন্তু রোগশয্যায় শুয়ে শোভনা তার আঁচটুকু পর্যন্ত পায় নি। মার মুখের সেই অম্লান হাসিটুকু, তাদের সেই সঙ্কীর্ণ ছোট খোলার চালের ঘরটুকু আর তার নোংরা পরিবেশকে কি আশ্চর্য যাদুতে শুচিস্নিগ্ধ প্রসন্ন করে দিয়েছে যেন।

দুখী বৌদের পাড়া ছেড়ে তখন তারা আরেক অঞ্চলে বাসা নিতে বাধ্য হয়েছে।

এ বাসার সব দোষ ত্রুটি অসুবিধার মধ্যে একটি সৌভাগ্যের জন্যে তখন সে কৃতজ্ঞ।

তার ঘরের ছোট খুপরি জানলাটা খুললে খানিকটা পোড়ো জমি দেখা যায়। সেখানে আশেপাশে তাদের চেয়েও দরিদ্র বাসিন্দারা তাদের গুল ঘুঁটে শুকোতে দেয়। দু' একটা ছাগল-গরু চরতে আসে ধুলোয়-ঢাকা আগাছার শুকনো ঝোপে বিরল এক-আধটা সরস কচি পাতার সন্ধানে। বিকেলে ছেলের দল আসে খেলতে।

ওই জানলাটুকুর মুক্তি আর মার অম্লান মুখের হাসিটুকুই তখন শোভনাকে জোর দিয়েছে জীবনের জন্যে যোঝবার।

নেহাৎ সঙ্কীর্ণ ঘর। একটা ছোট তক্তপোশেই প্রায় সবটা জুড়ে যায়। তক্তপোশের তলাতেই সংসারের যা কিছু জিনিসপত্র রাখা হয়েছে, মায় রান্নার সরঞ্জাম পর্যন্ত।

রান্না অবশ্য হয়েছে ঘরের কোলের সরু রকটিতে। অনুপমের সেইখানেই শোবার ব্যবস্থা। মা সেই সঙ্কীর্ণ ঘরের মেঝেতেই শুয়ে কাটিয়েছেন।

বিছানায় শুয়ে শুয়েই শোভনার তখন প্রায় সমস্ত দিনরাত কাটে। জোর করে উঠতে চাইলেও মা তাকে পারতপক্ষে উঠতে দেন নি।

কিন্তু রোগের কথা বা তার জন্যে কোন দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তার ছায়াও কখনও তাঁর মুখে দেখা যায় নি। সবটাই যেন নিতান্ত সহজ-স্বাভাবিক ব্যাপার। অনায়াসে যেন এ সব কিছু তাচ্ছিল্য করা যায়।

মাকে ভালো করে জেনেও রোগের গ্লানিতে বিকৃত মনে এক-একবার শোভনার মনে হয়েছে, মা বোধ হয় একেবারে নির্বিকার নির্লিপ্ত। তাঁর কর্তব্যই তিনি শুধু করে যান, কিন্তু শোভনার এই জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্ব যেন তাঁকে বিচলিতই করে না।

দুঃখ দুর্ভাবনার বদলে মার মুখে সেই কৌতুক পরিহাসের সুরই শোনা গেছে যখন-তখন।

সেই কৌতুকের সুর নিয়েই মা হঠাৎ একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে তাকে বিমূঢ় বিহ্বল করে বিদায় নিয়ে গেছেন এ জীবন থেকে।

সেদিন রাত্রে ঘুমের মধ্যে ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে গিয়ে শোভনা জেগে উঠে মাকে ডেকেছে। এরকম তার প্রায়ই হয় তখন। মাকে ডাকলে তিনি উঠে গা মুছিয়ে দরকার হলে জামা বদলে দেন।

সেদিন মাকে ডেকে কোন সাড়া পায় নি। না পেয়ে একটু বিস্মিতই হয়েছে। মার ঘুম অত্যন্ত সজাগ। বিশেষ করে তার এই অসুখের মধ্যে মা তার সামান্য একটু নড়াচড়ার শব্দও যেন টের পান ঘুমের মধ্যে।

প্রথম বার সাড়া না পেয়ে শোভনা পর পর কবার ডেকেছে। শেষে রাগ করেই জোর করে উঠে বসে বলেছে, এত ডাকছি শুনতে পাচ্ছ না মা!

মা তাহলে বাইরে গেছেন, মনে হয়েছে একবার। কিন্তু তাও নয়।

ঘরে তার অসুখের জন্যে তখন বাতি রাখা হয় না। হ্যারিকেনটা বাইরের রকেই থাকে।

বাইরে সেদিন বুঝি একটু জ্যোৎস্না ছিল। জানলার ফাঁকে-আসা তারই আলোয় মা নিচেই শুয়ে আছেন, শোভনা দেখতে পেয়েছে।

কিন্তু তবু সাড়া নেই কেন?

উদ্বিগ্ন হয়ে শোভনা অনুপকে ডেকেছে, ওগো, শোন, বাতিটা নিয়ে এস শীগগির।

তার পর নিজেই তক্তপোশ থেকে নেমে পড়েছে।

অনুপম তার ডাকে জাগে নি। কম্পিত পায়ে শোভনা নিজেই টলতে টলতে বাইরে থেকে হ্যারিকেনটা নিয়ে এসেছে। সলতেটা তুলে আলোটা বাড়িয়ে দিয়ে মার দিকে চেয়ে বিস্মিত হয়ে গেছে।

মা জেগেই আছেন। একটা হাত বুকের ওপর রেখে কি একটা দুঃসহ যন্ত্রণা যেন চাপতে চেষ্টা করছেন।

কি হয়েছে মা! কি হয়েছে? শোভনা মার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

ওই যন্ত্রণার মধ্যেই মার মুখে যেন কি এক কৌতুকের রেখা ফুটে উঠেছে স্তব্ধ হাসির মত।

প্রায় চুপি চুপি অস্পষ্ট স্বরে যা বলেছেন, তা ভাল বোঝা যায় নি। মনে হয়েছে যেন বলেছেন, এবার আর কে হারায়!

বাইরে কার পায়ের শব্দ আর গলা শোনা যাচ্ছে।

আশুবাবুই কি ফিরলেন?

নয়

হ্যাঁ, আশুবাবুই ফিরেছেন। কিন্তু একলা নয়। সঙ্গে আরও দু' একজন যেন আছে।

আশুবাবু তাঁদের যা বলছেন তা শুনতে পেয়ে কিন্তু শোভনাকে একটু বিস্মিত ও উদ্বিগ্ন হয়েই উঠে দাঁড়াতে হল।

আশুবাবু কুণ্ঠিত স্বরে বলছেন, থাক, আর আমায় ধরতে হবে না। এটুকু আমি নিজেই যেতে পারব। আপনাদের কষ্ট দিলাম বলে সত্যি লজ্জা পাচ্ছি।

সে কি বলছেন! অপরিচিত কণ্ঠে প্রতিবাদ শোনা গেল, কষ্ট আমাদের কিসের! আপনাকে একটু ধরে এনেছি মাত্র, আর ত কিছু করি নি। না, চলুন, একেবারে আপনাকে ঘরে না পৌঁছে দিয়ে ফেরা আমাদের উচিত হবে না।

আশুবাবুর মৃদু প্রতিবাদ খাটল না, বোঝা গেল।

শোভনা দাঁড়িয়ে উঠে এগিয়ে যেতে গিয়েও দ্বিধাভরে পারে নি। দরজার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। এখন আশুবাবুকে ধরে দুটি

অপরিচিত ভদ্রলোক বারান্দার ওপর উঠে আসায় সে ভেতরে সরে গেল।

অপরিচিত দুজন দরজার কাছে এসেই বিদায় নিয়ে যাচ্ছিলেন। একজনের হঠাৎ শোভনার দিকে দৃষ্টি পড়ায় কর্তব্যের খাতিরে আশ্বাস দেওয়া প্রয়োজন মনে করেই বোধ হয় ব্যাপারটা তিনি একটু বুঝিয়ে বললেন, তেমন কিছু হয় নি। ভয় পাবেন না। শুধু এখন দু' চারদিন বেরুতে দেবেন না।

কিছুই না বুঝলেও শোভনাকে নির্দেশটা মানবার প্রতিশ্রুতি হিসাবে মাথাটা একবার হেলাতে হল। ভদ্রলোকর কাছে বিশদ বিবরণ জানবার উৎসাহ বা প্রয়োজন তার নেই। ব্যাপারটা যে গুরুতর কিছু নয় তা জেনে ও আশুবাবুকে প্রায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে দেখেই কতকটা সে নিশ্চিন্ত। এখন যা জানবার আশুবাবুর কাছেই জানতে পারবে।

ভদ্রলোকেরা চলে যাবার পর আশুবাবু কিন্তু ব্যাপারটা তাচ্ছিল্য-ভরেই উড়িয়ে দিতে চাইলেন।

কিছু হয় নি মা। কিছু না। অনেকটা হেঁটে একটু ক্লান্ত হয়েছিলাম কিনা—তাই মাথাটা একবার একটু ঘুরে গিয়েছিল। তাও পড়ে যাই নি। বারান্দার রেলিংটা ধরে একটু বসে পড়েছিলাম।

তেমন কিছু না হলে ওঁরা আপনাকে ধরে আনবেন কেন? শোভনা সত্যিকার একটু উদ্বেগ নিয়েই প্রশ্ন করলে। আশুবাবু ব্যাপারটা এমন হাল্কা করবার চেষ্টা না করলে সে বোধ হয় তেমন ভাবিত হত না।

আশুবাবু কিন্তু কিছুতেই নিজের অসুস্থতা স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। হেসে বললেন, ওই ত বুড়ো হওয়ার শাস্তি মা। হয় লোকে উপদ্রব মনে করে, নয় অসহায় অক্ষম ভেবে করুণা করতে চায়। কত বললাম কিছু আমার হয় নি, আমি নিজেই যেতে পারব, তা কিছুতে শুনলে না। বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছে না দিয়ে ছাড়লে না।

সেটা ওঁদের অপরাধ বলে ত ভাবতে পারছি না! মাথা ঘুরে আপনি পড়ে গিয়েছিলেন এটা ত ঠিক?

সে কি জোয়ান ছেলেরাও কখনও যায় না?

তা যাবে না কেন? শোভনা এবার বৃদ্ধের অযৌক্তিকতায় না হেসে পারল না, তাদের বেলাতেও সেটা অসুখ বলেই ধরা হয়। আর জোয়ানদের সঙ্গে আপনার ত আকচা-আকচির সম্পর্কে নয় যে, তাদের দিকে টেনে বললে হিংসে হবে। অনেকটা হেঁটে ক্লান্ত হওয়ার দরুন মাথাটা ঘুরে গেছল বলছেন। এত রাত পর্যন্ত এতখানি ঘুরেছেনই বা কেন?

প্রশ্নটা করেই নিজের গলার স্বর ও বলার ধরন সম্বন্ধে শোভনা যেন সবিস্ময়ে প্রথম সচেতন হয়ে উঠল।

আশুবাবুর সঙ্গে এ ভাবে কথা সে বলছে কিসের জোরে? সম্পর্কটা এই কয়েক দিনের সংসর্গে অনেকটা সহজ হয়ে এলেও এই স্তরে ত কখনো পৌঁছয় নি! তার প্রীতি, কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার মধ্যে কৃত্রিমতা না থাক, অভিভাবিকার অধিকারে এমন শাসনের সুর নিজের অজ্ঞাতেই তার কণ্ঠে এল কি করে? আশুবাবু কি মনে করছেন কে জানে!

কিছু মনে করা দূরে থাক, আশুবাবুই অত্যন্ত যেন কুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন। বেশ ইতস্ততঃ করে বললেন, মানে, একটা জরুরী ব্যাপার ছিল কিনা, তাই একটু···

প্রসঙ্গটা এতদূর এনে ফেলে আর থেমে যাওয়া যায় না। শোভনা তাই সুরটা ভর্ৎসনা থেকে মৃদু অনুযোগে নামিয়ে এনে বললে, যত জরুরীই হোক এত রাত পর্যন্ত ঘোরা আপনার খুব অন্যায় হয়েছে। আর অমন মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়াটা হেসে উড়িয়ে দেবার জিনিস নয়। কালই আপনাকে ডাক্তার দেখাতে হবে।

বেশ ত! বেশ ত! তাই না হয় দেখাব, তা হলেই ত হল। আশুবাবু যেন শোভনাকেই সন্তুষ্ট করে তার সমর্থন আদায় করতে

ব্যস্ত—কিন্তু জরুরী ব্যাপারটার জন্যে যাওয়া মোটেই অন্যায় হয় নি। না গেলে এমন পাকা খবরটা পেতাম!

আশুবাবু কেমন একটু বিজয় গর্বেই শোভনার দিকে চেয়ে এবার হাসলেন।

এই পাকা খবরটা কি, সে বিষয়ে প্রশ্ন করার আমন্ত্রণ বুঝেও শোভনা ইচ্ছে করেই সে ধার দিয়ে গেল না। অনিচ্ছায় নিজের অধিকারের সীমা যেটুকু সে একবার লঙ্ঘন করেছে তাই যথেষ্ট। আর সে ভুল তার হবে না।

অনেক রাত হয়ে গেছে। খেতে দিচ্ছি আসুন। বলে আশুবাবুর ইচ্ছাটা না বোঝার ভান করেই সে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াল।

হ্যাঁ, যাচ্ছি যাচ্ছি। বলে আশুবাবুই তাকে ডেকে থামালেন, কই, পাকা খবরটা কি তা জানতে চাইলে না?

চাওয়া কি আমার উচিত! শোভনাকে একটু হেসে বলতেই হল।

বা! তোমার খবর আর তুমি জানতে চাইবে না!

আমার খবর! শোভনা সত্যিই বিস্মিত।

তোমার মানে তোমারই দরকারী খবর। আশুবাবু আর নিজেকে যেন চেপে রাখতে পারলেন না,—কি জন্যে আজ বেরিয়েছিলাম জান?

শোভনাকে চমকে ওঠার জন্যে প্রস্তুত হওয়ার সময়টুকু দিতেই বুঝি একটু থেমে আশুবাবু নিজেই আবার বললেন, অনুপমের ঠিকানা বার করতে।

শোভনা বিস্ময়ে সত্যিই নির্বাক্ হয়ে চেয়ে রইল।

আশুবাবু নিজের উৎসাহে বলে চললেন, তোমায় ত কিছু বলি নি। দেখেছ কি না জানি না প্রায় ফি রবিবার আমার পুরনো এক বন্ধু উমেশ রক্ষিত একটু গল্পগুজব করতে, কখনও বা দাবার ছকটা নিয়ে বসতে আসে। তোমায় আনবার আগে অনুপম

যখন ঘরটা ভাড়া করে কদিন একলা ছিল তখন উমেশের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল। আগের রবিবার উমেশ না আসায় একটু ভাবনায় পড়েই সেদিন তার কাছে দুপুরে গেছলাম খোঁজ নিতে। বয়স ত হয়েছে দুজনেরই, একেবারে বড় তলব না হোক অসুখ-বিসুখ ত হতে পারে। উমেশ কিন্তু আমায় দেখে অবাক্। আমায় নাকি রবিবারে অন্য কাজের দরুন আসতে পারবে না বলে সে খবরই পাঠিয়েছিল। কাকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছিল জিজ্ঞাসা করাতে বললে কি জান?

উত্তর পাবার জন্যে এ প্রশ্ন নয় বুঝে শোভনা নীরবেই দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু আশুবাবুর দীর্ঘ বর্ণনা কোন্ অপ্রত্যাশিত উদ্ঘাটনের অপেক্ষায় প্রশ্নের ছলে এখানে থেমেছে তা নির্ভুলভাবে অনুমান করতে পেরেও তার কোন চাঞ্চল্য নেই কেন? সে কি ভেতরে-বাইরে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে বলে?

আশুবাবুর কাছে সেই আশাতীত খবরই এবার পাওয়া গেল। তিনি শাখা-প্রশাখা ও পল্লবের কিছু বাদ না দিয়ে সবিস্তারে যা বললেন, তার সার হল এই যে, অনুপমের ঠিকানা পাওয়া গেছে। আশুবাবুর বন্ধু উমেশ রক্ষিত তাঁদের পাড়ার একটি স্টেশনারি দোকানে কি কিনতে গিয়ে তাকে দেখেন ও সে এখনও আশুবাবুর ভাড়াটে মনে করে তার মারফৎ আশুবাবুর কাছে খবর পাঠান। সেদিনটা বৃহস্পতিবার ও দোকানের ছুটির দিন বলে উমেশবাবুকে নিয়ে আশুবাবু আর অনুপমের খোঁজে যান নি। সে দোকান চেনে উমেশবাবুর জানা এমন একটি লোককে আজ বিকেলে এখান থেকে তাঁকে নিয়ে যাবার জন্যে আসতে বলেছিলেন। দোকানে গিয়ে অনুপমকে অবশ্য পাওয়া যায় নি। কদিন ধরে সে দোকানে নাকি আসছে না জেনেছেন। দোকান থেকে তার বাসার ঠিকানা সংগ্রহ করে আশুবাবু সেই বাসায় খোঁজ করতেও বেরিয়েছিলেন। শুধু ঠিকানার কিছু গোলমালের জন্যে ঠিক জায়গায় পৌঁছতে পারেন নি।

সমস্ত বিবরণ সাঙ্গ করে আশুবাবু আশ্বাস দিয়ে হেসে বললেন, আর ভাবনা করো না মা। একবার যখন খেই পেয়েছি—ও ঠিকানা আমি খুঁজে বার করবই।

শোভনা তখনও নীরব। তার মুখের দিকে চেয়ে কি যেন একটা বুঝে আশুবাবু আবার বললেন, তুমি আর একটা বিষয়েও নিশ্চিন্ত থাকতে পার। উমেশ বা কাউকে আসল কথা আমি কিছু বলি নি। উমেশ ত ভেবেছে, বাকি পাওনা আদায় করবার জন্যেই আমার অনুপমকে খোঁজার এত গরজ!

আশুবাবু নিজের মনেই হেসে উঠলেন।

শোভনা কিছু না বলে এবার ঘরের মধ্যে আসন পেতে রান্নাঘর থেকে খাবার আনতে গেল।

শোভনা খাবার সাজিয়ে দেবার পর আসনে বসে আশুবাবু একটু ক্ষুণ্ণ স্বরেই এবার বললেন, এত কথা শুনে তুমি ত কিছুই বললে না! অনুপমের খোঁজে যাওয়া কি আমার অন্যায় হয়েছে মনে কর?

শোভনাকে এবার একটা উত্তর দিতেই হল। ম্লানভাবে একটু হেসে বললে, খোঁজ করতে গিয়ে নিজের শরীরটা যে পাত করতে বসেছিলেন সেটা অন্যায় বইকি!

অমন করে কথা এড়াবার চেষ্টা করো না। আশুবাবু হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, খোঁজ করতে যাওয়াটা আমার যদি অনধিকার চর্চা মনে কর ত তাই স্পষ্ট করে বল।

বৃদ্ধের উত্তেজনা শান্ত করবার জন্যে শোভনা জোর করেই একটু হেসে বললে, বেশ, স্পষ্ট করেই বলছি, অনধিকার চর্চা আমি মনে করি না।

আশুবাবু কিন্তু তাতে ক্ষান্ত হলেন না। অসন্তোষের স্বরেই বললেন, তবে? তবে চুপ করে থাকার মানে?

চুপ করে থাকা ছাড়া কি আমি বলতে পারি বলুন। আপনি আমার জন্যে অনেক কিছু করেছেন, তার ওপর আমারই নিরুদ্দেশ

স্বামীর খোঁজ করতে গিয়ে আজ নিজেকেই শেষ করতে বসেছিলেন। আপনার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। কিন্তু আজকের ব্যাপারে আপনার জীবনে এমন উপদ্রব হয়ে ওঠার জন্যে নিজেকে একান্ত অপরাধীই মনে হচ্ছে। তাই চুপ করে আছি।

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে শোভনা মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলে। দু' চোখের উদ্গত অশ্রু লুকোবার জন্যেই বোধ হয়।

আশুবাবুই এবার একেবারে অপ্রস্তুত। অত্যন্ত কুণ্ঠিত স্বরে এলোমেলো ভাবে বললেন, কৃতজ্ঞতা, অপরাধ, ও সব কথা আসছে কোথা থেকে! মাথাটা একটু ঘুরে গিয়েছিল বলে আমি কি মারা গেছি নাকি! সে ভয় নেই। এ পাকা হাড় অত সহজে যাবার নয়! কিন্তু আমি বলছি কি, এ ব্যাপারে—মানে এই খোঁজ পাওয়ার খবর শুনে তোমার একটু আগ্রহ দেখলে ত মনটা খুশী হয়। এমন ত আর নয় যে, অনুপমের খোঁজ করতেই আর তুমি চাও না?

হঠাৎ মুখটা ফিরিয়ে শোভনা সোজা আশুবাবুর দিকে তাকিয়ে দৃঢ় স্বরে বললে, যদি বলি তাই!

মানে? আশুবাবু বিমূঢ়।

মানে, তাকে খোঁজ করে লাভ কি বলতে পারেন? আপনার কথাতেই ত বোঝা যাচ্ছে সে অসুখে পড়ে নি, মারা যায় নি, বেশ সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় কাজ-কর্ম করছে। তা সত্ত্বেও নিজে থেকে যে নির্বিকারভাবে সরে যায়, এই শহরে থেকেও যে দেখা হবার ভয়ে পালিয়ে বেড়ায় তাকে খুঁজে বার করবার জন্যে ব্যাকুল আমি হব কেন!

কেন? আশুবাবু আবার উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, আর কিছু না হোক তাকে উচিত শিক্ষা দেবার জন্যে। বিয়ে-করা স্ত্রীকে যে অসহায় নিঃসম্বল অবস্থায় ফেলে গা ঢাকা দিয়ে বেড়ায় তার রীতিমত শাস্তি হওয়া উচিত।

শাস্তিই না হয় হল, তাতে আমার কোন্ ক্ষতিপূরণটা হবে!

বলে শোভনা আর সেখানে বসতে পারলে না। উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুতপদে সোজা তার নিজের ঘরে গিয়ে দরজায় খিলটা এঁটে দিলে।

কি বুঝে বলা যায় না, আশুবাবু সে রাত্রে অন্ততঃ তাকে আর ডাকতে আসেন নি।

দশ

সারারাত সেদিন শোভনা ঘুমোয় নি। বিছানায় শোয় নি পর্যন্ত।

অনেক রাত পর্যন্ত তক্তপোশের গায়েই হেলান দিয়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে, তারপর আশুবাবুর ডাকতে আসার সম্ভাবনা আর নেই যখন মনে হয়েছে তখন খিল খুলে দরজার বাইরের সঙ্কীর্ণ রোয়াকটুকুতে গিয়ে বসেছে।

শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া কি তৃতীয়া হবে। ক্ষীণ বাঁকা চাঁদ কখন পশ্চিম আকাশে একটু দেখা দিয়েই ডুবে গেছে। চারিদিকে নিরবচ্ছিন্ন গাঢ় অন্ধকার।

এই অন্ধকার তার হৃদয় মন চেতনাকেও যদি ঢেকে দিতে পারত, ভেবেছে শোভনা। মনের ভেতরকার অসহ্য দুর্বোধ এক জ্বালা যদি পারত ভুলিয়ে দিতে।

অনুপমের ফিরে আসা সম্বন্ধে সব আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে যেদিন এ বাড়িতে এসেছিল সেদিনকার মনের অবস্থার সঙ্গে আজকের যেন আকাশ-পাতাল তফাৎ।

সেদিন হতাশা ও বিমূঢ়তার মধ্যেও ছিল কেমন একটা কঠিন সঙ্কল্পের দৃঢ়তা। হার মানবে না সে, হার মানবে না। এই কথাটাই মন্ত্রের মত জপ করে সে নিজেকে সজাগ করে তুলেছে বার বার।

আজ সে মন্ত্রও যেন নিরর্থক হয়ে গেছে কি এক সমস্ত শরীর মন বিষ-করে-তোলা তিক্ততায়।

অনুপম আর ফিরবে না যেদিন নিশ্চিত ভাবে বুঝেছিল সেদিন একটা গভীর বেদনাতেই কাতর হয়েছিল শুধু।

আজ অনুপম এই শহরেই তাকে ছলনায় ভুলিয়ে পরিত্যাগ করে লুকিয়ে আছে জেনে একটা নিদারুণ অপমানের জ্বালাই প্রধান হয়ে উঠেছে।

ভাগ্যেরও যেন এ একটা নিষ্ঠুর পরিহাস।

কি দরকার ছিল অনুপমের এই খবরটুকু আশুবাবুর নিঃস্বার্থ হলেও নিরর্থক হিতৈষণার দরুন পাওয়ার। নিজের মনকে সে তৈরীই করে নিয়েছে অনেকখানি। যবনিকা টেনে দিয়েছে সেই ছিন্ন সম্পর্কের ওপর। আজ আকস্মিক ভাবে সে যবনিকা আবার তুলে ওঠার পর কি সে করবে?

এক হিসেবে অনুপমের সংবাদ এভাবে পাওয়াটাই শুধু অপ্রত্যাশিত, নইলে তা বিস্ময়কর বা কল্পনাতীত কিছু নয়। অনুপম হঠাৎ কোন দুর্ঘটনায় মারা গিয়ে বা আহত অক্ষম হয়ে তার সঙ্গে আর দেখা করতে আসতে পারছে না, এ সম্ভাবনার কথা ক্ষণিকের জন্যে মনে উদয় হলেও শেষ পর্যন্ত সে মিথ্যা বলেই জেনেছে। মনের গোপনে সে তখন থেকেই জানে যে, অনুপম স্বেচ্ছায় তাকে পরিত্যাগ করেছে। এই কলকাতায় না হোক, অনুপম যে অন্য কোথাও আছে তাও বুঝতে তার বাকি ছিল না।

আঘাতটা আজ অত তীব্রভাবে লেগেছে শুধু সেই ধোঁয়াটে সম্ভাবনাটা সত্য বলে জেনে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়ায়। এই প্রমাণটুকু এখনই না পেলে কি চলত না!

যে ভাবে আশুবাবুর কাছ থেকে আজ উঠে এসেছে তাতে আশুবাবু যদি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকেন তা হলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। হয়ত তার মানসিক অবস্থা বুঝে তার প্রতি মমতাতেই তিনি আজ আর তাকে কিছু বলতে আসেন নি। সেই না-আসার সঙ্কল্পের পেছনে আহত অভিমানও একটু থাকা স্বাভাবিক।

আজকের এ রাত শেষ হবে। আজ কিছু না বলুন আশুবাবু কাল এ বিষয়টা একেবারে মন থেকে মুছে দেবেন না। মুখে তিনি কিছু বলুন বা না বলুন, শোভনা এ ব্যাপারে কি করবে তা দেখবার জন্যে তিনি উৎসুক ও উদ্বিগ্ন থাকবেন নিশ্চয়।

যা আজ জানা গেছে তা অস্বীকার করে নির্লিপ্ত নির্বিকার হয়ে থাকাও শোভনার পক্ষে সম্ভব নয়। অন্ততঃ আশুবাবুর আশ্রয়ে থেকে ত নয়ই।

এ খবর পাবার পর একটা কিছু তাকে করতেই হবে। কি করবে সে? আশুবাবুর সঙ্গে গিয়ে অনুপমকে তার অজ্ঞাতবাস থেকে পাকড়াও করবে? কথাটা ভাবতেই যে দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে তাতে ঘৃণায় লজ্জায় গ্লানিতে সমস্ত শরীরটা শিউরে ওঠে।

শেষ যে পাড়ায় সে হাসপাতালে যাবার আগে ছিল, মা যেখানে মারা যান, সেই পাড়াতে এমনি একটা ঘটনার কথা তার মনে পড়ে যায়।

ব্যাপারটা এক হিসেবে একই জাতের। পাত্র-পাত্রীর ভূমিকা শুধু ভিন্ন। প্রকাশভঙ্গিটাও আলাদা।

সেখানে স্বামী এসেছে পলাতকা স্ত্রীর খোঁজ পেয়ে আত্মীয়বন্ধুর সাহায্যে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে।

মা তখনও জীবিত। শোভনার মাথার দিকের যে জানলাটি দিয়ে মুক্তির আস্বাদ সে পেত সেই জানলাই সেদিন বীভৎস এক জীবন-নাট্য মেলে ধরেছিল।

জানলার বাইরের সেই পোড়ো জমিটিতে লোকে লোকারণ্য। সমবেত সকলের গোলমাল ছাড়িয়ে একটি তীক্ষ্ণ নারী-কণ্ঠ আকাশ যেন বিদীর্ণ করছে। নারী-কণ্ঠটি পলাতকা স্ত্রীরই। ভাষাটা বাংলা না হলেও বুঝতে কষ্ট হয় নি যে, স্বামিত্বের দাবী নিয়ে যে এসেছে তার বিরুদ্ধেই বিষোদ্গারটা চলছে। স্বামীর ভূমিকায় অবাঙালী একজন গোয়ালা। দেশ থেকে যাকে রীতিমত শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান করে সে

বিবাহ করে এনেছিল সে স্ত্রী কিছুদিন বাদেই গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। স্বামী অনেক খোঁজ-খবরের পর বছর দুই বাদে আজ সেই নিরুদ্দিষ্টা স্ত্রীর খবর পেয়েছে। জেনেছে যে তারই দেশোয়ালী আরেক জনের সঙ্গে তার নিরুদ্দিষ্টা পত্নী সুখেস্বচ্ছন্দে এই শহরেই ঘরকন্না করছে। সে তাই সদলবলে এসেছে তাকে নিয়ে যেতে। স্ত্রী কিন্তু যেতে রাজী নয়। গোয়ালা-স্বামীর স্বামিত্বই সে স্বীকার করতে চায় না। বাঙালী-অবাঙালী মিলে সমবেত জনতা তখন দু' পক্ষে ভাগ হয়ে গেছে। একটা রক্তারক্তি বুঝি হয় হয়। কিন্তু সেই দাঙ্গাহাঙ্গামার ভয়ে যতটা নয়—যাকে কেন্দ্র করে এই কুরুক্ষেত্রের সূচনা সেই স্ত্রীর কুৎসিত গালাগালির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত অভিযোগ শুনতে শুনতে শোভনার কেমন যেন একটা অসহ্য অনুভূতি হয়েছিল। মনের যন্ত্রণাটা শারীরিক হয়ে উঠেছিল তীব্রভাবে। নারী-পুরুষের সম্বন্ধের এমন নগ্ন বীভৎস বিচার তার কল্পনার বাইরে ছিল।

মা বাইরে কি কাজে গেছলেন। ঘরে এসে গোলমাল শুনে জানলাটা বন্ধ করে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শোভনা তাও দিতে দেয় নি। কি একটা অসহ্য যন্ত্রণাময় আকর্ষণ তাকে ওই জানলার জান্তব জীবন-নাট্যের দিকে টেনে রেখেছে।

ঝগড়ার শেষ মীমাংসা কিছু হয় নি। স্বামীর পক্ষ আদালত পুলিশের ভয় দেখিয়ে চলে গিয়েছিল। পোড়ো জমির জটলাও ভেঙে গিয়েছিল ধীরে ধীরে।

রোগের স্বাভাবিক অবসাদ ও গ্লানি দ্বিগুণ বেড়ে গিয়ে শোভনা সারা বেলা বিছানা থেকে মাথা তুলতে পারে নি।

না, এরকম উৎকট কিছু অনুপমকে খুঁজতে গিয়ে হবে না নিশ্চয়। কিন্তু যা হবে তাও ত কম অসহ্য নয়।

আশুবাবু চেঁচামেচি করবার মানুষ নন। অনুপমকে তিনি খুঁজে বার করে হৈচৈ নিশ্চয় কিছু করবেন না। তাকে বাইরে কোথাও ডেকে নিয়ে যেতেই চাইবেন।

অনুপম যদি না যেতে চায় তাঁর সঙ্গে? কারুর সামনাসামনি এরকম বেঁকে দাঁড়ানো তার স্বভাববিরুদ্ধ হলেও বেকাদায় পড়লে কে যে কি করে তা ত বলা যায় না।

অনুপম সেরকম কিছু বেয়াড়া হয়ে উঠলে আশুবাবু নীরবে তা মেনে নিশ্চয় নেবেন না। তখন পাড়াপ্রতিবেশীর ডাক পড়বে। জটলা হবে। অভিযোগ বিচার ব্যাখ্যা কিছুই বাদ যাবে না। কৌতূহলী জনতার সামনে দাঁড়িয়ে শোভনাকে সেই সবই সহ্য করতে হবে।

কথা কিছু উঠলে বিরুদ্ধ পক্ষ একটা দাঁড়াবেই। তার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি ফেলবার লোকেরও নিশ্চয় অভাব হবে না।

সেই আলোচনার কেন্দ্র হয়ে ওঠবার কথা ভাবলেই সমস্ত মন বিদ্রোহ করে ওঠে।

আশুবাবুর মনের ইচ্ছা যদি পূরণ করতে হয় তাহলে ত তাঁর সঙ্গে সত্যিই ওই অবস্থায় না গিয়ে পড়ে উপায় নেই।

আশুবাবুকে শেষ যা বলে এসেছে তাতে তিনি নিজে থেকেই সমস্ত ব্যাপারটার ওপর দাঁড়ি টানতে পারেন। কিন্তু তাই যদি টানেন মনে মনে খুব খুশী নিশ্চয় হবেন না। শোভনার মনের গতিটা বুঝতে পারবেন কি না তাও সন্দেহ।

তাঁর কাছে ব্যাপারটা বোধ হয় সোজা অঙ্কের মত। নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর খোঁজ পেলে স্ত্রীর কর্তব্য তাকে আর পালাতে না দেওয়া। আর স্বামী যদি তবু নিজের দায় এড়াতে চায় তাহলে তাকে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা দরকার।

অমন সোজা অঙ্কের মতন ব্যাপারটা বুঝলে অনেক আগেই ত একটা মীমাংসার রাস্তা শোভনা নিতে পারত।

কিন্তু সে অনুপমকে আর খোঁজ করে গিয়ে ধরতেও চায় না, তার অপরাধের জন্যে শাস্তি দিতেও।

তবে—হ্যাঁ, 'তবে' একটু আছে। সে 'তবে' হল একটা ঈষৎ

বেদনাময় কৌতূহল। কেন, কি কারণে অনুপম এমন করে তাকে ফেলে যেতে পারল তা জানবার একটা আগ্রহ মনকে এখনও যে পীড়িত করে তা অস্বীকার করতে পারবে না। এ শুধু অসমাপ্ত একটা কাহিনীর শেষ ব্যাখ্যাটুকু জানবার নৈর্ব্যক্তিক বিশুদ্ধ কৌতূহল বলে মনকে বোঝাবার চেষ্টা করে লাভ নেই। এই কৌতূহলটুকুর মধ্যেই ছিঁড়ে ফেলতে চাওয়া সম্বন্ধের রক্তাক্ত একটা ছুটো শিরা এখনও স্পন্দিত হচ্ছে।

এই কৌতূহলকেও সে প্রশ্রয় না দিতে দৃঢ়সঙ্কল্প।

একটা উপায় তাই তার বার করা দরকার, আশুবাবুকে আহত না করে এই অপ্রত্যাশিত সঙ্কট থেকে মুক্তি পাওয়ার।

আশুবাবুর আশ্রয় ছেড়ে চলে গেলে সব সমস্যার অবশ্য সমাধান হয়ে যায় এখুনি।

কিন্তু কাল সকালে উঠেই তা যে সম্ভব নয় তা শোভনা ভাল করেই জানে। এক বস্ত্রে এ আশ্রয় ছেড়ে যাওয়া যদি সম্ভবও হত তাহলেও আশুবাবুকে জানিয়ে বা না জানিয়ে চলে যাওয়ার মত অকৃতজ্ঞ নির্মম সে হতে পারবে না কিছুতেই।

কাল সকাল বেলা আশুবাবুর সামনে গিয়ে তাকে দাঁড়াতেই হবে। আশুবাবু নিজে থেকে যদি কিছু নাও বলেন তবু এ ব্যাপার সম্বন্ধে নীরব হয়ে থাকা তার চলবে না।

প্রথম উত্তেজনার ঢেউটা শরীর মনের ওপর দিয়ে বয়ে গিয়ে একটা গভীর অবসাদ এখন রেখে গেছে।

রাত কত হয়েছে কে জানে!

আকাশ কখন ঘন মেঘে ঢেকে গেছে; একটা তারাও দেখা যাচ্ছে না। কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি তার গায়ে এসে পড়ল।

না, আর এমন করে বসে থাকা যায় না।

শোভনা ধীরে ধীরে উঠে নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করলে।

দরজা এতক্ষণ হাট হয়েই ছিল। অভ্যাসের দরুনই আলোটা

একবার জ্বেলে ঘরটা দেখে নেবার কথা মনে হল। ক্লান্ত ঔদাসীন্যে সে উৎসাহ হল না। কি হবে আর দেখে! তার ঘরে চোর এসে লুকিয়ে থাকবে না নিশ্চয় নেহাৎ আহাম্মক না হলে।

বিছানা না পেতেই সে তক্তপোশটার ওপর গড়িয়ে পড়তে যাচ্ছিল। পিঠের কাছে কি একটা ঠেকায় চমকে আবার উঠে বসল। অন্ধকারে হাত দিয়ে ধরতেই মনে পড়ে গেল নিখিল বক্সীর দেওয়া কাগজগুলো বিছানার উপর রেখে গিয়েছিল।

এগারো

আশুবাবু পরের দিন সত্যিই অবাক্ করে দিলেন।

শোভনা উত্তেজনা উদ্বেগের প্রচণ্ড দোলায় দুলে শেষ রাতে একেবারে ঘুমের অতলে ডুবে গেছল। ঘুম ভাঙল যখন তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে।

প্রথমটা জানলা দিয়ে আসা সকালের আলোয় চোখ মেলে কিছুক্ষণ কেমন একটা আশ্চর্য নিস্তরঙ্গ প্রশান্তি অনুভব করেছিল। যেন এই মুহূর্তের চেতনাটুকু ছাড়া জীবনে আর কিছু নেই। এই বিছানা-তোশকহীন তক্তপোশের শক্ত কাঠের স্পর্শটুকু, জানলা দিয়ে দেখতে-পাওয়া উঠোনের ওধারে গাছপালার মাথায় আকাশের রক্তাভ একটু উজ্জ্বলতা, সমস্ত শরীরে অতৃপ্ত ঘুমের ঈষৎ গ্লানির সঙ্গে মেশানো একটা লঘু তৃপ্তির স্বাদ। অসুখের প্রথম ধাক্কা সামলে ওঠার পর হাসপাতালে যেমন হত এক-একদিন। দায়িত্বহীন ভাবে জীবন ছুঁয়ে শুধু ভেসে থাকার একটা অনুভূতি। যা কিছু চঞ্চল, উদ্বেল, বিক্ষুব্ধ করে মনকে, সব যেন অনুভূতির গভীর তরলতার নিচে তলিয়ে গেছে। শুধু আছে একটা ভারমুক্ত চেতনা, অগ্রপশ্চাৎ কার্য-কারণ ইচ্ছা সঙ্কল্পের ধারাবাহিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন। আজ কাল পরশুর কোন ভাবনার জবর দাবী নেই, শুধু উপস্থিতকে গ্রহণ করবার একটা নির্লিপ্ত মৃদু ঔৎসুক্য।

হাসপাতালেও এ ভাবটা বেশীক্ষণ থাকত না। হঠাৎ যেন বুদ্বুদের অদৃশ্য আবরণ ফেটে গিয়ে চমক ভেঙে যেত।

আজ চমকটা ভাঙল আরও বেশী তীব্র ভাবে। মনের ওপরকার স্বচ্ছ প্রশান্তির ঢাকনাটা হিংস্র ভাবে ছিঁড়ে ফেলে বাস্তব বর্তমান প্রবল বন্যাবেগে যেন ঝাঁপিয়ে এল তার চেতনায়। নতুন একটি দিন তার সমস্ত দায়, সমস্ত অমীমাংসিত প্রশ্ন নিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তাকে এড়িয়ে যাবার কোন পথ নেই। এমন কি এই সকাল বেলাটুকু কর্তব্য সম্বন্ধে দ্বিধাসংশয় নিয়ে কাটান যাবে না। যা করবার এখুনি করতে হবে। আশুবাবুর হেঁসেলে গিয়ে রান্নার যোগাড় দিয়েই তা নিত্য নিয়মিত ভাবে সুরু। কিন্তু আজকের সেই সামান্য কাজটার অর্থ ও চেহারা সত্যিই আলাদা হয়ে গেছে।

বিছানা ছেড়ে উঠে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আশুবাবুর কাজে যাবার জন্যে শোভনা প্রস্তুত হচ্ছিল এমন সময়ে ঘরের বাইরে আশুবাবুরই গলা পাওয়া গেল, তুমি কি উঠেছ শোভনা মা ?

গলাটা স্নেহার্দ্র বলেই মনে হল, কিন্তু এক পলকে শোভনার মনটা তখন যেন বেঁকে দাঁড়িয়েছে।

আশুবাবু যদি নিজে থেকেই এখুনি প্রসঙ্গটা আবার তুলতে এসে থাকেন তাহলে সে বুঝি নিজেকে সংযত রাখতে পারবে না। ফল তার যাই হোক।

বাইরে অবশ্য সে শান্ত কণ্ঠেই সাড়া দিলে, হ্যাঁ, এই যে যাচ্ছি।

ভেজানো দরজাটা খুলে দিয়ে তার পর বাইরে বেরুবার উপক্রম করতে আশুবাবুই কিন্তু বাধা দিলেন।

না না, এখন তোমায় রান্নার জন্যে ডাকতে আসি নি। চল, তোমার ঘরেই চল। দুটো কথা আছে।

একটু বিস্মিত হয়েই শোভনা আবার ঘরে গিয়ে ঢুকল। আশুবাবু তাহলে সকাল বেলাটাই তিক্ত না করে ছাড়বেন না! পাছে মনের

এই অবস্থায় বেশী রূঢ় হয়ে পড়ে এই ভয়ে নিজেকে কিছুটা সামলাবার জন্যে ঘরের একটি মাত্র চেয়ারের সে ধুলো মুছে পরিষ্কার করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

আশুবাবু কিন্তু ততক্ষণে তক্তপোশের ওপরই নিজে থেকে বসে পড়েছেন।

সে কি! ওখানে বসলেন কেন? শোভনা সত্যিই কুণ্ঠিত হয়ে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, আশুবাবু বাধা দিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি পড়াশুনা কি করেছ বল ত মা?

প্রশ্নটা এমন অপ্রত্যাশিত যে, শোভনা খানিকক্ষণ কোন জবাব দিতেই পারলে না। আঘাত ঠেকাবার জন্যে যে-ভাবে মনটাকে তৈরি করেছিল, তা থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনতে বিলম্ব হল।

আশুবাবু শোভনার নীরবতার ভুল অর্থ করে তাকে আশ্বস্ত করবার জন্যে বললেন, তোমার লজ্জা করবার কিছু নেই। বি-এ, এম-এ পাস করবার কথা জানতে চাইছি না। এমনি পড়াশুনা কিছু করেছ ত? স্কুলে কতদূর পড়েছ?

স্কুলের পর কলেজেও কিছুকাল পড়েছি। শোভনা একটু বিমূঢ় ভাবেই জানালে।

কলেজেও পড়েছ! আশুবাবু যেন একটু বেশীরকম উল্লসিত হয়ে উঠলেন, ব্যস! তা হলে আর কথাই নেই! কি পড়েছিলে? আর্ট্‌স্?

হ্যাঁ। তবে তাকে পড়া বলে না। এক বছরও পুরো কলেজে যাই নি।

ওই ওতেই হবে! ওতেই হবে! আশুবাবু উৎসাহের চোটে তক্তপোশ থেকে উঠেই পড়লেন। তার পর শোভনার অনুচ্চারিত বিমূঢ়তা একটু যেন অনুমান করে বললেন, কেন এ কথা জিজ্ঞেস করলাম বুঝতে পারছ না ত? না পারবারই কথা। বলছি, এখনই বলছি।

কথাটা ব্যাখ্যা করে বলবার আগে আশুবাবু আবার কিন্তু অসংলগ্ন ভাবে সম্পূর্ণ অন্য পথে চলে গেলেন। গম্ভীর হয়ে বললেন, কাল তুমি অমন করে চলে আসবার পর সারা রাত ঘুমোতে পারি নি, জান!

আমার সত্যি অন্যায় হয়েছিল। শোভনা আন্তরিক ভাবে তার অপরাধ স্বীকার করবার সুযোগটুকু নিলে।

না না, তোমার অন্যায় কিছু হয় নি। আশুবাবু প্রতিবাদ করলেন,—অন্যায় হয়েছে আমার। রাত্রে ভাবতে ভাবতে সেই কথাটাই বুঝলাম। বুঝলাম যে, কোথায় মনের মধ্যে একটা গোপন অহঙ্কার জন্মেছে আর সেই অহঙ্কারে তোমার ওপর একটু জোর খাটাতে আরম্ভ করেছি।

এ সব আপনি কি বলছেন! শোভনা সত্যিই বিমূঢ় ভাবে জানালে, আমি আপনার কেউ নয়। তবু আপনি আমার যা উপকার করছেন তা কি ভোলবার!

ঠিক, ঠিকই বলেছ! আর অহঙ্কার ত সেইজন্যেই জন্মেছে। তোমার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই, শুধু একটু স্নেহ মায়া পড়েছে বলে তোমায় আশ্রয় দিয়েছি, কাজ দিয়েছি, তোমার উপকার করতে চাইছি। কিন্তু আসলে সবটাই ত নিঃস্বার্থ পরোপকারের গর্বে নিজের ইচ্ছে আর মতামত তোমার ওপর চালান। তোমাকে সত্যিই যত স্নেহই করি না, নিজের মর্জি-মাফিক তোমার ভাল করবার অধিকার আমার নেই।

শোভনা বিস্ময়বিমূঢ় ভাবে এবার নির্বাক্ হয়েই রইল। আশুবাবুকে এ যেন সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্যরূপে দেখা। কিন্তু সত্যিই কি তাই? আশুবাবুকে সহৃদয় এবং সেকেলে বৃদ্ধ বলে যে একটা সোজা হিসেব ধরে রেখেছিল, এই কদিনের পরিচয়েই ত কবার তা একটু-আধটু পাল্টাতে হয়েছে। তাঁর মনের চেহারায় এই দিক্‌টাও সুতরাং

অবিশ্বাস্য হবে কেন ? হয়ত অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট একটা ধারণা ধরে থাকা ভ্রান্তি ছাড়া কিছু নয়।

আশুবাবুর বেলা বিস্ময়টা একটু বেশী বোধ করছে, এ কথা ঠিক। কাল রাত্রি পর্যন্ত তাঁর যে পরিচয় পেয়েছে তার সঙ্গে আজ সকালের এই কঠিন আত্মবিচার সহজে মেলান যায় না।

আশুবাবু তাঁর কথার উত্তর কিছু চান নি। কি উত্তর দেবে তা ভেবেও পাচ্ছিল না। তবু কিছুই না বলে এতক্ষণ চুপ করে থাকতে শোভনা অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছিল।

আশুবাবু সে অস্বস্তি নিজেই দূর করে বললেন, এ সব কথা তোমার কাছে বলবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু তোমার পড়াশুনার কথাটা যে-জন্যে জিজ্ঞাসা করতে এলাম, তার ভূমিকা হিসেবেও এগুলো না বললে নয়। আমি কাল রাত্রেই ঠিক করেছি মা, তোমায় আর আমি আমার হেঁসেল ঠেলতে দেব না।

কেন ? শোভনার গলায় যে কাতরতা ফুটে উঠল সেটা আন্তরিক।

শুধু রাঁধুনীগিরি করিয়ে তোমার জীবনটা নষ্ট করবার অধিকার আমার নেই বলে। তাতে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে তুমি ছুটো খেয়ে-পরে থাকতে পারবে বটে, কিন্তু তাই ত সব নয় ?

শোভনা অবাক্। এ সব ত তারই নিজের মনের কথা ! আশুবাবু যেন তার প্রতিধ্বনি করছেন মাত্র। কিন্তু আশুবাবুর মুখে শুনে নিজের কথারই প্রতিবাদ করতে হল।

সব হয়ত নয়, কিন্তু তা ছাড়া আমার উপায় কি ? আপনার এ অনুগ্রহ না পেলে আমায় ত রাস্তায় দাঁড়াতে হত।

তা হয়ত হত। কিন্তু সে কথা ভাববার এখন আর ত দরকার নেই। রাস্তায় যখন দাঁড়াতে দিই নি, তখন শুধু ছুমুঠো অন্ন আর মাথা গোঁজবার একটু আশ্রয় দিয়েই তোমায় বেঁধে রাখব কেন ? আমি তোমায় অনুগ্রহ করতে চাই না, চাই সত্যিই তোমায় সাহায্য

করতে। সেই জন্যেই তোমার লেখাপড়ার খোঁজ নিলাম। তুমি যদি কোথাও পড়ানর কাজ পাও নিতে পার না ?

খুব পারি ! কিন্তু সেরকম কাজ কি সত্যি পাব ! তা ছাড়া…

শোভনাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে আশুবাবু বললেন, তা ছাড়া যা আছে সে সব কথা পরে ভাবা যাবে। আপাততঃ টিউশনি গোছের একটা কাজ বোধ হয় তোমায় যোগাড় করে দিতে পারব। আশা করছি তোমার অপছন্দ হবে না।

অপছন্দ হবে কেন ? শোভনা কৃতজ্ঞ স্বরে জানালে, আপনি কি যেমন-তেমন একটা কাজ আমায় দেবেন ? শুধু একটা কথা ভাবছি।

একটু চুপ করে থেকে শোভনা দ্বিধাটুকু জয় করে বললে, ভাবছি কালকের কথাটা আপনি আজ আর একেবারেই তুললেন না কেন ? কাল আপনার কাছে ওই খবর পেয়ে যা বলেছি তাতে কি অসন্তুষ্ট হয়েছেন ? জানি না আমার কথাটা আপনাকে বোঝাতে পেরেছিলাম কি না ?

প্রথমে সত্যিই বুঝতে পারি নি মা। আশুবাবু গাঢ় স্বরে স্বীকার করলেন, প্রথমে না বুঝে সত্যিই অসন্তুষ্ট হয়েছিলাম। শুধু অসন্তুষ্ট কেন, তোমার ওপর রাগই হয়েছিল। তার পর প্রায় সারারাত ওই কথা নিয়েই ভেবেছি। ভেবে বুঝেছি, তোমার মন দিয়ে তোমাদের সমস্যা বোঝা যেমন আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তেমনি আমার নিজের সংস্কার ও ধারণা থেকে কোন মীমাংসা তোমার ওপর চাপাবার অধিকারও আমার নেই। তোমার নিজের পথ তুমি নিজেই বুঝে নেবে। তোমার মধ্যে সে জোর যে আছে তার প্রমাণ একটু পেয়েছি বলেই মনে হচ্ছে। অনুপমকে তুমি যদি খুঁজতে চাও, আমি সাহায্য করতে প্রস্তুত। তা যদি না চাও, আমি আমার জেদ তোমার ওপর খাটাব না। এই সব কথাই ভাবতে ভাবতে নিজের দুর্বলতাটুকুও বুঝতে পেরেছি মনে হয়েছে। তাই থেকেই বুঝেছি, স্নেহ মায়া মানে

নিজের ধারণা ও ইচ্ছে দিয়ে তোমায় ঘিরে রাখা নয়। তোমার নিজের একটা স্বাধীন সত্তা আছে। নিজের জীবন নিজেই তুমি চালাবে। স্নেহ মায়া যেটুকু আমার আছে তাই দিয়ে তোমায় শুধু আমি সাহায্য করতে পারি।

শোভনাকে শোনাবার জন্যে শুধু নয়, নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করবার জন্যেই যেন এক নাগাড়ে কথাগুলো বলে আশুবাবু চুপ করলেন।

অভিভূত হয়ে শোভনা তার পর অনেকক্ষণ কিছু বলতে পারল না। চোখ যে কেন তার তখন অশ্রুসজল হয়ে এসেছে সে জানে না। মুখ ফিরিয়ে আঁচলে চোখটা একবার মুছে নিয়ে সে প্রায় অস্ফুট স্বরে বললে, আপনার কাছে নতুন করে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আপনাকে ছোট করব না। কিন্তু আপনাকে যে অনেকখানি ভুল বুঝেছিলাম তা স্বীকার করে ক্ষমা চাইছি। আর একটা কথাও সেইসঙ্গে স্বীকার করছি। আপনার কাছে আশ্রয় পেয়ে শুধু আপনার রান্নাবান্না করে দিন কাটাতে মনটা মাঝে মাঝে বেঁকে দাঁড়িয়েছে সত্যি। নিজেই অন্য কোন উপায় খোঁজবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, আপনার স্নেহের আড়ালে এমনি করেই যদি জীবনটা কেটে যায় তাতে ক্ষতি কি! আপনার হেঁসেলে কাজ না করে অন্য কোথাও পড়ানর কাজ নিলে কি-ই বা নতুন কিছু আমার হবে। আমার জীবনে আর কিছু ত হবার নয়?

কেন নয়! আশুবাবু দৃঢ়স্বরে প্রতিবাদ জানালেন, জীবনের হওয়া না হওয়া কি এর মধ্যেই সব কষে ফেলা যায়! এই বয়সেই অনেক কিছু হয়ত তুমি দেখেছ, সয়েছ। কিন্তু তবু সামনে অনেক পথ পড়ে আছে তোমার। সে পথে সাহস করে পা বাড়াতে তোমায় হবে। ভবিষ্যৎ অজানা হলেও। সে যাই হোক, আমার হেঁসেলে তোমার আর বন্দী থাকা চলবে না। আমার হেঁসেলই কদিন বাদে বন্ধ হয়ে যাবে।

বুঝতে পারলাম না আপনার কথা! আপনার খাওয়াদাওয়ার একটা ব্যবস্থা ত দরকার।

সে ব্যবস্থা হবে। আশুবাবু এবার হেসে বললেন, তবে এখানে আর নয়। আমি কিছু দিনের জন্যে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াব ঠিক করছি। বয়স অনেক হয়েছে, এর পর আরো অথর্ব হয়ে পড়লে যা পারব না, মনের সেই সাধটা এখন মিটিয়ে নিতে চাই।

এক সঙ্গে অনেক প্রশ্নই মনে ভীড় করে এল বলে বোধ হয় শোভনা প্রথমটা কিছুই বলতে পারল না।

আশুবাবুই নিজে থেকে তাকে আশ্বস্ত করবার জন্যে আবার বললেন, তোমার কোন ভাবনা নেই মা। যাবার আগে তোমার একটা কাজের ব্যবস্থা আমি করে দিয়ে যাবই। আর তুমি যদি নিজে থেকে না চলে যেতে চাও, তাহলে এ ঘর চিরকালের জন্যে তোমার, এইটুকু জানিয়ে যাচ্ছি।

আশুবাবু দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে গিয়ে আবার ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, হ্যাঁ, আজ শুধু তোমার নিজের রান্নাবান্না তুমি করে নিও। আমায় আজ আমার সেই বন্ধু উমেশ তার ওখানে খেতে বলেছে।

আশুবাবুকে বেরিয়ে যেতে গিয়ে এবারও কিন্তু থমকে দাঁড়াতে হল।

কই, শোভনা দেবী কোথায়? বলে নিখিল বক্সীই দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে।

আশুবাবুকে দেখে প্রায় তাচ্ছিল্যভরে নমস্কারের ভঙ্গিতে একবার হাত তুলে সে তাঁকে পাশ কাটিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে শোভনাকে উদ্দেশ করে বললে, দেখেছেন আমার দেওয়া কাগজগুলো!

দেখেছি। শোভনার গলার স্বরে একটু অস্বস্তিই প্রকাশ পেল, ওগুলো আপনি নিয়ে যেতে পারেন।

শাভনা পাশের তাকের ওপর থেকে কাগজপত্রগুলো নিয়ে নিখিলের দিকে বাড়িয়ে ধরলে। গত রাত্রে বিছানায় পিঠে ঠেকবার

পর কৌতূহল বশে সে সত্যিই এগুলোর ওপর আলো জ্বেলে একবার চোখ বুলিয়েছিল।

আশুবাবু তখনও দরজার একটা পাল্লা ধরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

নিখিল তাঁর দিকে একবার চেয়ে নিয়ে হেসে উঠে বললে, এগুলো কি আমি ফেরত নিতে এসেছি? আপনাকেই দিয়েছি ওগুলো। পড়ে কি মনে হল বলুন, নেবেন ও চাকরি?

কি চাকরি? আশুবাবু গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করলেন।

এই মেয়েদের যে সব চাকরির আজকাল সুবিধে! নিখিল আশুবাবুর দিকে ফিরে সহজ রসিকতার সুরে বললে, শাড়ী আর চেহারার একটা নতুন মার্কেট তৈরী হচ্ছে ত! যত বিদ্যাবুদ্ধিই থাক, ধুতি-পাঞ্জাবির সেখানে কোন দাম নেই।

উনি কি চাকরির কথা আপনাকে বলেছিলেন? আশুবাবুর গলার স্বর বেশ কঠিন।

উনি বলবেন কেন? আমার কি নিজে থেকে বোঝবার ক্ষমতা নেই? নিখিল অবিচলিত ভাবে হাসতে হাসতে বললে, স্বামী ত একরকম নিরুদ্দেশ বলেই মনে হচ্ছে। অন্ততঃ এতদিনে আমি ত একবার চুলের টিকিও দেখি নি। আর সেরকম কিছু না হলে আপনার ওখানে ওঁকে রাঁধুনীগিরিই বা করতে হবে কেন? তাই এই কাজটার খবর পেয়ে ওঁকে কাগজপত্রগুলো দিয়ে গেছলাম। ওঁর এখন যা অবস্থা তাতে এরকম কাজ পেলে খুশীই হবেন ভেবেছি।

শোভনা তখন আশুবাবুর অকারণ অপ্রত্যাশিত অপমানের কথা ভেবে লজ্জায় সঙ্কোচে এতটুকু হয়ে গেছে।

আশুবাবু কিন্তু আগের চেয়ে নরম গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, কাজটা কি?

কি বলুন না শোভনা দেবী? আপনি ত সব পড়েছেন?

শোভনাকে নীরব দেখে নিখিল বেশ জোরেই হেসে উঠে আবার বললে, আমি যেন কি একটা অন্যায় করে ফেলেছি মনে হচ্ছে। কিন্তু প্রতিবেশী হিসেবে একটু সাহায্য করতে চাওয়া ছাড়া কোন অভিসন্ধি আমার আছে বলে ত বুঝতে পারছি না। বেশ, আপনিই শুনুন আশুবাবু। কাজটা যাকে বলে ইংরেজী কটা কাগজের বিজ্ঞাপনের প্রতিনিধির। আজকাল মেয়েদেরই এসব কাজে চাহিদা হয়েছে। চেহারা চলন বলন একটু ভাল হলে তারা যা আদায় করতে পারে পুরুষদের তা সাধ্য নেই। কাজকর্মের সন্ধানেই ত দিনরাত ঘুরি। এ কাজটা নিজের জন্যেই খুঁজতে গেছলাম। কিন্তু খবরাখবর নিয়ে বুঝলাম, ওখানে আমার মত হতভাগা পুরুষের কোন আশা নেই। তাই ওঁর কথা ভেবে ওঁকেই সুবিধেটা দিতে চেয়েছিলাম। খুব অন্যায় কিছু করেছি?

না, তা করেন নি। কাগজপত্রগুলো আমি একবার শুধু দেখতে চাই। বলে শোভনার হাত থেকে সেগুলো নিয়ে আশুবাবু বেরিয়ে গেলেন।

খানিক দুজনেই একেবারে নীরব।

নিখিলই প্রথম হেসে উঠে অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতাটা ভেঙে দিয়ে বললে, ব্যাপারটা কি হল সত্যিই বুঝতে পারছি না। আপনি হঠাৎ এমন আড়ষ্ট গম্ভীর হয়ে গেলেন কেন? কিছু নোংরা জঘন্য কাজে আপনাকে ঠেলতে চেয়েছি বলে মনে হচ্ছে?

তা হয়ত ঠেলেন নি, কিন্তু আশুবাবুকে আমার ঘরে অপমান করবার স্পর্ধা আপনি কোথায় পেলেন! শোভনার রুদ্ধ রাগের জ্বালা এতক্ষণে যেন ফেটে বেরুল।

অপমান! নিখিল যেন একেবারে হতভম্ব, আশুবাবুকে আবার অপমান করলাম কোথায়? ওঃ, ওঁর রাঁধুনীগিরির কথা বলেছি বলে? তাতে অন্যায়টা কি হয়েছে! সত্যিই ত তাই আপনি করছেন। এই কি আপনার যোগ্য কাজ নাকি?

আমার কি যোগ্য না-যোগ্য সে বিচার আপনার ওপর ছেড়ে দিয়েছি বলে ত মনে পড়ছে না! শোভনার গলায় এবার তীব্র বিদ্রূপের ধার।

আপনি রাগই করুন আর যাই করুন, সত্যি কথা আমি না বলে পারি না। ওই আমার বদ্‌স্বভাব। ও বৃদ্ধ যেভাবে কাগজগুলো নিয়ে গেলেন তাতে ত নিজে থেকে আপনার অন্নদাতা অভিভাবক হয়ে উঠেছেন বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু ওঁর তাঁবেদার হয়েই আপনি জীবন কাটাবেন নাকি! কাগজপত্র উনি ত দেখতে নিয়ে গেলেন কিন্তু অমন বিনে মাইনের রাঁধুনী উনি কি সহজে ছাড়তে চাইবেন? শুনুন, আপনার সম্বন্ধে কিছু খোঁজ আমি না নিয়ে পারি নি···

ধন্যবাদ! নিখিলকে মাঝ পথেই থামিয়ে দিয়ে শোভনা তিক্ত কঠিন স্বরে বললে, এখন অনুগ্রহ করে আপনি একটু যাবেন? আমি দরজাটা বন্ধ করতে চাই।

নাঃ, খুব কড়া অপমানই করতে চাইছেন বুঝতে পারছি। সব কেমন গণ্ডগোল হয়ে গেল। আচ্ছা, এখন আমি যাচ্ছি। আপনার মাথা ঠাণ্ডা হলে আর একবার বোঝাবার চেষ্টা করে দেখব।

মুখে একটু বিমূঢ় হাসি নিয়ে নিখিল বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই শোভনা সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিলে।

বারো

গলি-ঘুঁজি নয়, বেশ ফাঁকা খোলামেলা জায়গাই বলা যায়। কিন্তু কিছুদিন আগেও জায়গাটা যে শহরের বহু দূরে, সব কাজের বার, নাবাল জংলা জলা মাত্র ছিল তার চিহ্ন এখনও প্রচুর।

কোথাও যাদের ঠাঁই মেলে নি এই কচুরিপানায়-মজা অগভীর জলার ওপরই এসে তারা কোনরকমে ডেরা বেঁধেছিল। খোলার চাল, মুলী-বাঁশের দেওয়াল দেওয়া খুপরি খুপরি সব বাসা, বেশীর

ভাগই জলার ওপর মাচা বেঁধে বসানো। খরার দিনেও বাঁশের সাঁকো দিয়ে তাতে পৌঁছতে হয়েছে। বর্ষায় ত বাসার মধ্যেই থই থই করে জল।

সর্বহারাদের নিরুপায় বসতি যখন এখানে শুরু হয়েছিল তার পর অনেক বছর কেটে গেছে।

বসতি বেড়েছে। কচুরিপানার বংশই বছরের পর বছর নতুন করে বেড়ে জলার ওপর শুকনো খোলস বিছিয়ে বিছিয়ে মাটি উঁচু করে তুলেছে। নিজেদের চেষ্টায় পুকুর ডোবা কেটেও বাড়তি জলের সদ্গতি করে ডাঙা শুকনো করে তোলবার ব্যবস্থা হয়েছে কোথাও কোথাও।

কারুর কারুর ইতিমধ্যে ভাগ্যও ফিরেছে। মুলী-বাঁশের বদলে ইটের দেওয়াল, খোলার বদলে টিনের চালও দেখা যায় এখানে-সেখানে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও চারিদিকে কচুরিপানায়-মজা জলা এখনও আগের যুগের দখল সম্পূর্ণ ছাড়ে নি।

বাঁধানো সরল সোজা রাস্তা এখনও নেই। এলোমেলো ভাবে যেমন বসতি উঠেছে তেমনি ডোবা পুকুর জলা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আঁকা-বাঁকা পায়ে-চলার পথ। খানা-খন্দর ওপর কোথাও এক-আধটা নারকেল খেজুরের গুঁড়ি ফেলা। কোথাও তাও নেই।

এই পথেই সেদিন সকালবেলা শোভনাকে দেখা গেল। সঙ্গে আশুবাবু ত আছেনই, তাঁর বন্ধু উমেশবাবুও এসেছেন।

অনেক খুঁজে-পেতে তাঁরা এই এলাকাটা বার করেছেন কিন্তু আসল ঠিকানা এখনও পান নি।

এলাকাটা বড় ছোট নয়। বিস্তীর্ণ একটা বাদাগোছের জায়গা। বোধ হয় সেই জব চার্ণকের আমল থেকেই অব্যবহার্য বলে অবজ্ঞাত হয়ে পড়ে ছিল। রাজনীতির নিষ্ঠুর তামাসায় সেই জায়গাই ছিন্নমূল মানুষের কাছে পরম মূল্যবান হয়ে উঠবে কে জানত!

অন্য অনেক এ ধরনের বসতিতে যেমন, এখানে তেমন বাসিন্দাদের সংহতি গড়ে উঠতে পারে নি বিশাল বিস্তৃতির জন্যেই। ছাড়া ছাড়া ভাবে দু'চারটি ঘরের বসতি এক এক জায়গায় জড়ো করা। বসতির এক জটলার সঙ্গে আরেকের তেমন যোগাযোগ নেই।

জিজ্ঞাসাবাদ করে সঠিক খবর কোথাও তাই মেলে নি।

নতুন ডেরা এদিকে-ওদিকে এখনও অনেকে বাঁধছে। এ ত আর তাদের গ্রাম নয় যে, সকলের নাম মুখস্থ থাকবে?

তা ছাড়া নামটাও লুকোন কি না কে জানে।

উলঙ্গ অর্ধোলঙ্গ কৌতূহলী একদল ছোট ছেলেমেয়েদের কাছেই সাহায্য পাওয়া গেছে সবচেয়ে বেশী। এ অঞ্চলে নতুন চেহারা দেখে তারাই সঙ্গ নিয়েছে গোড়া থেকে।

এদের মধ্যে একটি ছেলে নিজের বৈশিষ্ট্যেই সর্দার স্থানীয়। চালাক চতুর সপ্রতিভ ছেলে। পরনে একটা ছেঁড়া তালিমারা খাটো খাঁকি রঙের হাফপ্যাণ্ট ছাড়া কিছু না থাকলেও তার চাল-চলনে একটা অকুণ্ঠ ভারিক্কি ভাব।

নামটা শুনে ও এ অঞ্চলে নতুন এসেছে জেনে অন্য সকলের গোল থামিয়ে সে ভুরু কুঁচকে কি একটু ভেবেছে তার পর চেহারার বর্ণনা নিজে থেকেই দিয়ে ঠিক হচ্ছে কি না জানতে চেয়েছে।

বর্ণনা নেহাৎ ভাসা ভাসা। চেহারার চেয়ে পোশাকটাই তার মধ্যে প্রধান। তবু কিছুটা মিল দেখে শোভনা তার বর্ণনা সমর্থন করেছে।

আপাততঃ সেই ক্ষুদে সর্দারের নির্দেশেই তারা চলেছে দূরের কটা নারকেল গাছ-ঘেরা বসতির দিকে।

অনুপমকে তার নতুন আস্তানায় খোঁজবার জন্যেই যে এ অভিযান তা বোধ হয় বুঝিয়ে বলবার দরকার নেই।

হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত শোভনা সেই সঙ্কল্পই আশুবাবুকে জানিয়েছে। নিজেই উৎসাহ করে আশুবাবুকে নিয়ে প্রথম উমেশবাবুর বাড়ি গেছে

এবং সেখান থেকে তাকে সঙ্গে নিয়ে এই অঞ্চলে এসেছে, অনুপম যে দোকানে কাজ করে সেখান থেকে যতটুকু সম্ভব খবর সংগ্রহ করে।

দোকানে গিয়ে অনুপমের দেখা পেলে অবশ্য এতদূর আসবার প্রয়োজন হত না।

কিন্তু দোকানে শোনা গেছে যে, অনুপম ক'দিন ধরেই নাকি কাজে আসছে না।

অনুপমকে দোকানে না পেয়ে শোভনা হতাশ কি বিস্মিত হয় নি। সে যেন মনে মনে জানত, অনুপমের দেখা অত সহজে পাওয়া যাবে না।

দোকানের মালিক ও অন্য একজন কর্মচারীর কাছে অনুপমের এখনকার বাসার যে ভাসা ভাসা হদিস পাওয়া গেছে তাও খুব ভরসা করবার মত বলে মনে হয় নি।

অনুপম কিছুদিন মাত্র এ দোকানের চাকরিতে ঢুকেছে জানা গেছে। স্থায়ী চাকরিও নয়, কদিনের জন্যে শিক্ষানবিশী বলা যায়। তার বিশেষ ঠিকানা পরিচয় তাই কেউ জানে না। কাজের শেষে একজন কর্মচারী ওই অঞ্চলের দিকে যেতে দেখেছে, এইটুকু মাত্র সন্ধানের সূত্র।

এই সূত্রটুকুর ভরসা না করে সন্ধানে ক্ষান্ত হওয়াও চলত।

কিন্তু শোভনা তা হয় নি। যত ক্ষীণ সূত্রই হোক, শেষ পর্যন্ত তা অনুসরণ না করে হাল ছাড়বে না এই এখন তার কঠিন প্রতিজ্ঞা।

অনুপমকে খোঁজা সম্বন্ধে অত দ্বিধা সংশয় উদ্বেগ এই সে রাত্রেও যার মনে ছিল তার হঠাৎ এই সঙ্কল্প একটু বিস্ময়কর সন্দেহ নেই।

মনের এই পরিবর্তনের ধাপগুলো তাই জানবার কৌতূহল হতে পারে।

শোভনা নিজেও সুস্পষ্টভাবে অবশ্য এ বিষয়ে কিছু বলতে পারবে না।

নিখিল বক্সী বেরিয়ে যাবার পর সশব্দে দরজা বন্ধ করে সে কিছুক্ষণ অক্ষম ক্ষোভে নিজের মনেই ফুলেছিল।

এ রাগটা ঠিক নিখিল বক্সীর ওপরও নয়, নিয়তি সংসার অনুপম সব যেন এক সঙ্গে জড়িয়ে গেছে একটা দুরন্ত ক্ষোভ ও অভিমানের লক্ষ্য হিসাবে।

আশুবাবু তাকে নিজের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে নিতে বলে গিয়েছিলেন।

শোভনা কিন্তু অনেক বেলা পর্যন্ত দরজা খুলে ঘরের বাইরেও যায় নি।

তার মনের গতি বুঝতে পারলে আশুবাবু হয়ত নিজেই তাকে ডাকতে পাঠাতেন। কিন্তু তিনি নিজেই তখন বেশ একটু বিচলিত। শোভনা যথাসময়ে নিজের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে নেবে, এই নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে একটু সকাল সকালই বন্ধু উমেশবাবুর বাড়ির দিকে তিনি রওনা হয়ে গেছেন।

অনেক বেলা পর্যন্ত শোভনা তাই নিজের মনের ক্ষুব্ধ উত্তেজনা নিয়ে একলা থাকতে পেরেছে।

সকালের এ ক্ষুব্ধ উত্তেজনা গত রাত্রের দ্বিধা সংশয়ের দোলা থেকে আলাদা। তার মন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রবাহে এখন ভেসে গেছে অস্পষ্ট একটা বিদ্রোহের চেতনায়।

যা কিছু আজ তার জীবনকে চারিদিক্ দিয়ে জড়িয়ে নিষ্ফল করে রেখেছে, এ সব ছিঁড়ে বেরিয়ে যাওয়া যায় না?

নাম ধাম পরিচয় এ সবই ত তার বেলায় নিরর্থক কটা বন্ধনের জাল মাত্র। এ সবই অস্বীকার করলে ক্ষতি কি?

সত্যিই যদি দুঃসাহসিক একটা ঝাঁপ দেয় ভবিষ্যতে, পিছনের সব কিছু চিহ্ন মুছে ফেলতে না পারুক সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে?

ধর্ম ন্যায় নীতির সংস্কারকে আঁকড়ে ধরে থাকার কোন মোহ ত তার থাকা উচিত নয়। মৃত্যুর অতল অন্ধকারের কিনারা থেকে

সে ফিরে এসেছে শুধু কি ক্ষীণ বিবর্ণ একটা জীবনধারা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে?

ভাগ্য তাকে বঞ্চনা করেছে, বিশ্বাসঘাতকতা করেছে অনুপম তার সঙ্গে, সেই বঞ্চনায় ও আঘাতে প্রতিশোধের আগুনই তার মধ্যে জ্বলে উঠা উচিত।

না, প্রতিশোধও নয়, তার তীব্র বাসনাও একটা বন্ধন, বিপক্ষকেই বিপরীত দিক্ দিয়ে একমাত্র আরাধ্য করে তোলা। প্রতিশোধে তার প্রয়োজন নেই। তার বদলে থাক অসীম ঔদাসীন্য। অনুপম একটা সাময়িক তিক্ত স্মৃতিমাত্র! আর ভাগ্য? ভাগ্য ত আসলে পুরুষ। তাকে উপেক্ষা করবার সাহস থাকলেই সে পদপ্রান্তে পড়বার জন্যে পিছু পিছু ফেরে।

শোভনার অস্থির উত্তপ্ত কল্পনা অদ্ভুত সব সম্ভাবনা তার সামনে যেন প্রত্যক্ষ করে তোলে।

ভাগ্য পুরুষ। আর পুরুষই আজ সবকিছুর রাশ নিজের হাতে ধরে বসে আছে। কিন্তু এই পুরুষ লোভী দুর্বল উদ্‌ভ্রান্ত। ইচ্ছে করলে, আর মনের অর্থহীন অনুশাসন অগ্রাহ্য করতে পারলে, এই পুরুষের জগতে শুধু অঙ্গুলি হেলনে নিজের ভাগ্য রচনা করা যায়।

তার জন্যে সামান্য যেটুকু উপকরণ দরকার তা কি তার একেবারেই নেই?

নিখিল বক্সীই ত এক দিক্ দিয়ে তা স্বীকার করে গেছে। শুধু যোগ্যতা নয়, নারীত্বের অন্য আকর্ষণ যেখানে প্রধান সম্পদ্, সে চাকরি শোভনাকে দেবার কথা নইলে সে ভাববে কেন?

সে সুন্দরী নয় শোভনা জানে, কিন্তু দেহসৌষ্ঠবের কিছু আকর্ষণ যে তার আছে একথাও তার অবিদিত নয়।

পুরুষের পৃথিবীকে যা টলায় সে শক্তি তার মধ্যে যতটুকুই থাক তা ব্যবহার করতে হলে ওই সামান্য বিজ্ঞাপন সংগ্রহের চাকরির জন্যে

করবে কেন? দাম যদি নিতে হয় তাহলে কড়ি নয় মোহরই তার চাই।

নিজেকে আর এক ভূমিকায় সে দেখবার চেষ্টা করে। না, উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল স্বৈরিণীর ভূমিকায় ঠিক নয়। এমন এক ভূমিকায়, যাতে মনের সংস্কার ও বিবেকের শাসনে জীবনকে শীর্ণ উপবাসী রাখার কোন গরজ নেই।

তার কল্পনার উত্তপ্ত প্রবাহ কতদূর তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেত বলা যায় না, কিন্তু মাঝ পথেই বাধা পড়েছে।

দরজায় কার যেন মৃদু করাঘাত।

আশুবাবুর কি নিখিল বক্সীর হতে পারে না। মধু হলেও দরজায় অত কোমল ভাবে ধাক্কা দেবে না। বাইরে থেকেই ডাকবে।

শোভনা একটু বিস্মিত হয়ে দরজাটা খুলেছে, খুলে অবাক্ হয়েছে আরও বেশী।

নিখিল বক্সীর বৃদ্ধা মা দরজায় দাঁড়িয়ে।

এ বাড়ীতে যতদিন আছে তার মধ্যে এক-আধবার সামান্য দু'একটা মৌখিক কথাবার্তার বিনিময় হলেও পরস্পরের ঘরে আলাপ করতে যাওয়ার মত কোন সম্বন্ধ তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে নি। বৃদ্ধা কোনদিন ইতিপূর্ব্বে তার ঘরে আসেন নি, সেও যাবার প্রয়োজন বোধ করে নি। এক হিসাবে এই ঘনিষ্ঠতার অভাবই শোভনার কাম্য ছিল। বৃদ্ধা যে গায়ে পড়ে আলাপ করতে উৎসুক হন নি তার জন্যে সে কৃতজ্ঞ।

কিন্তু আজ হঠাৎ সব কিছু উল্টে গেল কেন!

ভদ্রতার খাতিরে 'আসুন' বলে বৃদ্ধাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে শোভনা সবিস্ময়ে সেই কথাই ভেবেছে।

বৃদ্ধা তার আহ্বানে ঘরে ঢুকেছেন এবং তার পর বেশীক্ষণ অনিশ্চয়তার দোলায় তাকে দুলিয়ে রাখেন নি।

নিখিল বক্সীর মা যে খুব প্রসন্ন মুখে তার দরজায় এসে দাঁড়ান নি

শোভনা আগেই তা লক্ষ্য করেছে। ঘরে ঢোকবার পর তাঁর মুখ আরও কঠিন হয়ে উঠেছে।

শোভনার দিকে সুস্পষ্ট ঘৃণার দৃষ্টিতে চেয়ে তিনি কোন রকম ভণিতা না করেই রূঢ়কণ্ঠে বলেছেন, তোমার অবস্থা আমি বুঝি বাছা। বিয়ে-করা স্বামী হোক না হোক, যার সঙ্গে ঘর করেছিলে সে ছেড়ে পালিয়েছে, এখন যাকে হোক পাকড়াও না করলে তোমার নয়। কিন্তু আমার ওই হতভাগা ছেলেটির দিকে নজর দিয়ে ত কিছু লাভ হবে না বাছা। ও ফুটো পয়সা দিয়ে তুমি করবে কি? তার চেয়ে শাঁসালো কাউকে ধরবার চেষ্টা কর।

কথাগুলো বলেই বৃদ্ধা চলে গেছেন। শোভনা তখন স্তম্ভিত অসাড় একটা পাথরের মূর্তি মাত্র।

কতক্ষণ, সে জানে না, যেন এক যুগ বাদে তার মনে হয়েছে দরজায় নিঃশব্দে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে।

মনের সাড় একটু ফেরবার পর লোকটাকে চেনাও গেছে। সে নিখিল বক্সী।

শোভনা চীৎকার করে নি, সশব্দে দরজা বন্ধ করে দেয় নি, শুধু বিস্মিত-করুণ ভাবে একটু হেসেছে এবার নিখিল বক্সীর দিকে চেয়ে।

নিখিল কিন্তু হাসে নি। তার তিক্ত রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠ শুধু শোনা গেছে, সন্তানের শুভকামনায় মার অন্ধ অস্থিরতার মহিমান্বিত রূপ ত দেখলেন। কোন কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করে তার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ না করাই উচিত। তবু দুটো কথা না বলে পারছি না। ফুটো পয়সার বেশী যার দাম নেই বলে জানেন সেই ছেলেরই সর্বনাশের ভাবনায় মা ভীত। তাঁর ধারণা, তাঁর ছেলের আপনার সম্বন্ধে দুর্বলতা জেগেছে। মা'র কখনও ভুল হয় না। মনের অগোচর কথাও তিনি জানতে পারেন। তাই আপনাকে জানিয়ে যাচ্ছি, ভবিষ্যতে আপনার ছায়া মাড়িয়েও আপনাকে বিড়ম্বিত করব না। তেমন বুঝলে এ বাসাও ছেড়ে যাব।

নিখিল কখন চলে গেছে তাও যেন ভাল করে শোভনা টের পায় নি।

মধু এসে তাকে যখন ডেকেছে তখনও সে দেওয়ালে ভর দিয়ে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে।

সেই দিন রাত্রেই আশুবাবুর কাছে অনুপমকে খুঁজতে যাওয়ার সঙ্কল্প সে জানিয়েছে।

আশুবাবু বিস্মিত হয়েছেন কিন্তু আপত্তি জানান নি।

শুধু বলেছেন, ভাল করে নিজের মনকে বুঝেছ ত মা! আমার কিংবা আর পাঁচজনের খাতিরে কিছু তুমি করো, এ আর আমি চাই না।

শোভনা এ কথার উত্তরে কিছু বলে নি, শুধু মৌনতা দিয়েই তার সঙ্কল্পের অটলতা বুঝিয়ে দিয়েছে।

আশুবাবু খানিক বাদে নিজে থেকেই আবার বলেছেন, নিখিলবাবুর দেওয়া কাগজগুলো আমি নাড়াচাড়া করে দেখলাম। আমার মনে হচ্ছে সাধারণ টিউশনির চেয়ে ও কাজ নেওয়াই তোমার পক্ষে ভাল।

এ সব কথা আমি এখন ভাবছি না। শোভনা শান্ত স্বরে বলেছে, চাকরি নেব কি না তাও ভাববার সময় এখনও আসে নি।

আশুবাবু কি বলতে গিয়ে থেমে গেছেন। শোভনার বর্তমান মনের অবস্থাটা ঠিক অনুমান না করতে পারলেও অন্য প্রসঙ্গে আগ্রহ যে তার নেই, এটুকু বুঝতে তাঁর দেরি হয় নি।

উমেশ রক্ষিতকে ধরে পরের দিন সকালেই অনুপমের খোঁজে বার হওয়ার এইটুকুই পূর্ব ইতিহাস।

অর্ধোলঙ্গ ছোকরা পথপ্রদর্শকের নামটা ইতিমধ্যে জানা গেছে।

জানিয়েছে সে নিজেই।

জলা জঙ্গলের পথে বেশ কিছুদূর হাঁটবার পর উমেশ রক্ষিতই

বুঝি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আর কতদূর যাব বল ত? তুমি ঠিক জান ত খোকা?

খোকা খোকা করছেন কেন? আমি কি খোকা? খোকা সম্বোধনে অপমানিত বোধ করে ছেলেটি জানিয়েছে, আমার নাম নসু।

যেভাবে নসু দাঁড়িয়ে পড়েছে তাতে মনে হয়েছে সম্বোধনের ত্রুটিতে সব বুঝি পণ্ড হয়।

হাসি চেপে আশুবাবু বলেছেন, তাই ত! নামটাই আমাদের আগে জেনে নেওয়া উচিত ছিল। সত্যি খুব অন্যায় হয়ে গেছে। কিন্তু নসু, যে-বাড়িতে আমাদের নিয়ে যাচ্ছ সেখানে অনুপমবাবুকে তুমি দেখেছ ত?

বাড়িতে দেখব আবার কি? নসু কিঞ্চিৎ অধৈর্যের সঙ্গে জানিয়েছে, আমি কি ওখানে থাকি যে বাড়িতে দেখব? এই রাস্তায় ওখানে যেতে দেখেছি। আর অনুপম-টনুপম আমি জানি না। নতুন লোক আর ধুতি-পাঞ্জাবি পরা ফিলিম ফিলিম চেহারা বললেন, তাই ত এদিক পানে যাচ্ছি। এখানে ধুতি-ফুতি কেউ পরে নাকি! সব পাজামা প্যাণ্ট। আর ফিলিম ফিলিম চেহারা বা দেখবেন কটা?

নসুর দীর্ঘ বক্তৃতার মাঝে তিনজনে হতাশ ভাবে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেছেন।

কিন্তু এতদূর এসে মাঝপথে ফিরে যাওয়ার কোন মানে হয় না।

নসুকে তোষামোদে সন্তুষ্ট করে তাই পথ দেখাতে রাজী করাতে হয়েছে আবার।

তিনটি নারকেল গাছের নিশানা দেওয়া যে বসতিতে নসু নিয়ে গেছে, চারিদিকের কচুরিপানায় ভরা জলার মধ্যে সেটি আধ-জাগা ছোট একটু চরের মত জায়গা। মাচার ওপরে পাখির খাঁচার মত ছোট ছোট কটি মুলী-বাঁশের বেড়ার ঘর বেঁধে তিনটি দরিদ্র পরিবার সেখানে কোনরকমে মাথা গুঁজে থাকে।

আশুবাবুদের আশঙ্কাই সত্য প্রমাণিত হয়েছে এবার। খোঁজ-খবর নিয়ে যা জানা গেছে—তাতে সকালের সমস্ত ঘোরাঘুরিই পণ্ডশ্রম বলে বুঝতে দেরি হয় নি। অনুপম বলে কেউ সেখানে থাকে না। সে নামও কেউ ওখানে শোনে নি।

উমেশ রক্ষিতই যেন হতাশ হয়েছেন সবচেয়ে বেশী। হতাশ ও লজ্জিত। অনুপমকে খুঁজে না পাওয়া যেন তাঁরই অপরাধ।

বাঁশের একটা নড়বড়ে সাঁকো সন্তর্পণে পার হতে হতে ফিরে আসবার পথে তিনি লজ্জিতভাবে বলেছেন, খবরটা এমন ভুয়ো হবে ভাবতেই পারি নি। আর তাদেরই বা দোষ কি। এমন উড়ো খবরে বিশ্বাস করে তোমাদের আনাই আমার অন্যায় হয়েছে।

শোভনা তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বলেছে, আপনার কি দোষ বলুন। যা করেছেন সে ত আমারই জন্যে। আমার জন্যে আপনাদের মিথ্যে হয়রান হতে হল, এই আমার দুঃখ।

হাতে ধরবার ও পা ফেলবার একটি করে মাত্র বাঁশ বাঁধা। সাঁকো থেকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ মাটিতে পা দিয়ে আশুবাবু শোভনার দিকে ফিরে কি বলতে গিয়ে থেমে গেছেন।

শোভনা সাঁকোর ওপরেই দাঁড়িয়ে পড়ে পিছন ফিরে কি যেন দেখছে।

কি দেখছিলে মা? শোভনা আবার মুখ ফিরিয়ে সাঁকো পার হবার জন্যে পা বাড়াতে আশুবাবু জিজ্ঞাসা করেছেন।

কিছু না। সাঁকো থেকে তাড়াতাড়ি নেমে এসে শোভনা যেন একটু কুণ্ঠিতভাবে কৈফিয়ৎ দিয়েছে তারপর, কত দুর্গতির মধ্যেও মানুষ বাঁচতে পারে তাই দেখছিলাম।

আপনি? আবার এসেছেন?

শোভনাকে চমকে দাঁড়াতে হল।

হ্যাঁ, সেই ছোকরাটিই পেছন থেকে ডাকছে। সেই নসু।

সকলকে এড়িয়ে নস্তুর কাছে ধরা পড়তে হবে শোভনা সত্যিই ভাবে নি।

এত বড় বিরাট অঞ্চল। এর মধ্যে পরিচিত বলতে ওই নস্তু আর তার দলের কয়েকটি ছেলেমেয়ে। তাদের কারুর চোখে পড়বার কথা শোভনার মনেই হয় নি।

কিন্তু দেখা গেল, আর যার হোক, নস্তুর চোখকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়।

আমি সেই দূর থেকে দেখেই আপনাকে চিনতে পেরেছি।

নস্তু কাছে এসে দাঁড়াল। তার পর বেশ একটু জেরার ভঙ্গিতেই জিজ্ঞাসা করলে, আজ আবার কাকে খুঁজতে এসেছেন?

একটা কিছু উত্তর না দিলেও চলে। নস্তুর কাছে জবাবদিহি দেবার কোন দায় ত তার নেই?

বললেই হয় একটু ধমক দিয়ে—সে খবরে তোমার কি দরকার বাপু? তুমি কি এখানকার পাহারাদার নাকি?

কথাটা মনে করেই কিন্তু হাসি পেল। নস্তুর সারল্যকে ওরকম অকারণ আঘাত দেওয়া তার সাধ্য নয়।

সেই হাসি নিয়েই সস্নেহে শোভনা বললে, কাউকে না খুঁজলে বুঝি এখানে আসতে নেই?

দূর!

হাতের গুলতিটা দিয়ে দূরের একটা পেয়ারা গাছে অকারণে তাচ্ছিল্যভরে একবার তাগ্ করে নস্তু বললে, এখানে সখ করে কেউ আসে বুঝি? এটা কি চিড়িয়াখানা, না গড়ের মাঠ?

না, নস্তুর কাছে যেমন-তেমন করে কথা ঘুরোন যাবে না।

শোভনা তবু আর একবার কথাটা এড়াবার জন্যে বললে, তুমি চিড়িয়াখানায় গেছ?

গেছি একবার। আবার যেতাম। কিন্তু চার আনা করে পয়সা

নেয় যে! বলেই নসু আবার নিজের প্রশ্নে ফিরে এল, কই, কাকে খুঁজতে এসেছেন বললেন না ত?

আমি নিজেই জানি না ত তোমায় কি বলব! শোভনা হাসল, আমি শুধু সেই—বাড়ীটায় একবার যাচ্ছি।

সেই তিন মাথা চরে?

তিন মাথা চর! শোভনা এবার বিস্মিত।

হ্যাঁ, ওই যেখানে তিনটে নারকেল গাছ আছে। ওটাকে আমরা তিন মাথা চর বলি। আমাদের এখানে সব ওই রকম নাম আছে কিনা! ওই যে দেখছেন মাথা-কাটা তাল গাছটা দাঁড়িয়ে আছে, ওর পেছনের বাসাগুলোকে আমরা বলি কাটামুণ্ডুতলা, আর ওই···

নিজের এলাকার ভৌগোলিক পরিচয় দিতে দিতে থেমে গিয়ে নসু জিজ্ঞাসা করলে, কিন্তু ওখানে ত আপনি সেদিন গেছলেন। ওখানে ত আপনাদের চেনা কেউ নেই!

তবু আর একবার এমনি আলাপ করতে যাচ্ছি। বলে শোভনা এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলে একটু দ্রুতপদেই।

কিন্তু নসুকে অত সহজে ছাড়ানো সম্ভব নয়।

ছুটে এসে শোভনার নাগাল ধরে ফেলে সে ভারিক্কি চালে বললে, ওখানে আপনি যাবেন কি করে? রাস্তা জানেন?

তা জানি বই কি! শোভনাকে হেসে বলতে হল, সেদিন যে এলাম! সেই ত বাঁশের সাঁকোটা দিয়ে যেতে হয়।

সে বাঁশের সাঁকো আর আছে নাকি! নসু তার বিশদ জ্ঞানের পরিচয় দিলে, এই কাল সকালে সেটা ভেঙে গেছে না! এখন অন্য রাস্তা দিয়ে যেতে হয়। চলুন, আপনাকে দেখিয়ে নিয়ে যাই।

অগত্যা নসুর নায়কত্ব শোভনাকে মেনে নিতেই হল।

আজ সকালে এখানে আসবার জন্যে রওনা হবার আগে শোভনার মনে দ্বিধা-সঙ্কোচ-সংশয় যথেষ্টই ছিল। ছিল, এখানে সেই প্রথম দিন এসে নিষ্ফল হয়ে ফিরে যাবার পর থেকেই।

মাত্র তিন দিন আগের কথা।

কিন্তু এই তিন দিনে তার জগৎটা আর একবার যেন ওলট-পালট হয়ে গেছে।

বাইরে থেকে কিছুই অবশ্য হয় নি বলে মনে হতে পারে।

ফিরে যাবার পর আশুবাবু সেদিন তাকে নিজের ঘরে বসিয়ে অনেকগুলো কথা বলেছিলেন। সে-সব কথা আশুবাবু বলবেন তা যেন তার জানাই ছিল।

আশুবাবু তাঁর বাড়ীতে শোভনার চিরকাল আশ্রয় থাকা সম্বন্ধে আর একবার গভীর আশ্বাস দিয়েছেন। তাঁর নিজের কিছুদিনের জন্যে বাইরে যাবার সঙ্কল্প সম্বন্ধেও অটলতা দেখিয়েছেন। সেই সঙ্গে শোভনাকে আবার অনুরোধ করেছেন, নিখিল বক্সীর প্রস্তাবিত কাজটা নেওয়ার কথা আরেকবার বিবেচনা করে দেখতে।

বলেছেন, আমি অনেক ভেবে দেখলাম মা। এরকম কাজ পেলে না নেবার কোন মানে হয় না।

অনুপমকে খুঁজতে গিয়ে বিফল হয়ে, ফিরে আসার পর থেকেই শোভনা কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক। তার দিক থেকে কোন জবাব না পেয়ে আশুবাবুকে আবার বলতে হয়েছে, আমি আর বেশীদিন এখানে নেই। যে কদিন আছি তার মধ্যেই তোমার একটা স্থিতি দেখে যেতে পারলে নিশ্চিন্ত হতাম। অনুপমবাবুকে খোঁজবার কোন চেষ্টাই তুমি কর, এ আর আমার ইচ্ছে নয়। সে যদি তোমাকে তার জীবন থেকে বাদ দিতে পেরে থাকে তা হলে তুমিই বা পারবে না কেন? সেই জন্য মনকে শক্ত করে তোমার সঙ্কল্প স্থির করতে হবে। তোমার নিজের আত্মসম্মান বজায় রাখবার জন্যেই তোমায় একটা কোন কাজ নিতে বলছি, নইলে তোমার মত একটা মেয়ের দু'বেলা দু'মুঠোর ব্যবস্থা করার সঙ্গতি আমার আছে। কিন্তু আমার কাছেও ঋণী আছ ভেবে নিজেকে তুমি ছোট মনে করবে, এ আমি চাই না। সত্যি কথা বলতে গেলে, নিখিল বক্সীর গায়ে পড়ে চাকরির খবর

দেওয়াটা আমার তখন অত্যন্ত খারাপই লেগেছিল। কিন্তু পরে কাগজপত্রগুলো দেখে বুঝলাম, কাজটা সত্যিই ভাল। এ কাজ পেলে নিতে তোমার আপত্তি করা উচিত নয়।

আপত্তি করবার আগে কাজটা ত পাওয়া দরকার। শোভনা একটু ম্লান হেসে বলেছে, নিখিলবাবু খবর এনেছেন মাত্র। এ কাজ যে আমি পাব তার ভরসা কি!

তা অবশ্য নিখিলবাবুকে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে। তুমি যদি বল ত আমিই জিজ্ঞাসা করতে পারি।

না, জিজ্ঞাসা করতে হলে আমিই করব। বলে শোভনা তখনকার মত উঠে পড়েছে। কিন্তু বাইরে যাবার আগে ফিরে দাঁড়িয়ে একটু হেসে স্বরটা হালকা রাখবার চেষ্টা করে বলেছে, আপনি কিন্তু এখন আর কোথাও নেমন্তন্ন নিয়ে বসবেন না। যে কদিন আছেন, আমার রান্নাই আপনাকে খেতে হবে। আপনার জন্যে এইটুকু করবার অধিকার থেকে বঞ্চিত করবেন না।

কথাগুলো বলেই আশুবাবুর উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করে শোভনা তার নিজের ঘরে চলে গেছে। কেন যে এই কথাগুলো বলতে তার চোখ জলে ভরে উঠেছে, সে নিজেও ভাল করে জানে না। এইটুকু শুধু বুঝেছে যে, এই অশ্রু শুধু কৃতজ্ঞতার নয়। ভুল হোক, ঠিক হোক, অনুপমের এই শহরেই থাকার খবর পাবার পর থেকে যা যা ঘটেছে, যে অশান্তি, উদ্বেগ, যন্ত্রণা, হতাশা ও অকারণ লাঞ্ছনার তিক্ততা তাকে জর্জর করেছে, সব যেন এক সঙ্গে জড়িত হয়ে তার অশ্রুর উৎস খুলে দিয়েছে।

নিজের ঘরে গিয়ে দরজায় খিল দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে শোভনা সেদিন কেঁদেছিল নিজেকে সংবরণ করবার কোন চেষ্টা না করে।

তার জীবনে এবারের এই নিদারুণ সঙ্কট দেখা দেবার পর এই তার

প্রথম কান্না। অবারিত উচ্ছ্বসিত। যেন তার গভীর হৃদয়মূলই এক দুর্বার স্রোতে ভেসে যাচ্ছে।

এমন কান্না জীবনে কখনও সে কেঁদেছে বলে মনে পড়ে না।

মৃত্যুর সেই প্রথম সুস্পষ্ট পদক্ষেপ অনুভব করবার পরও কান্না তার আসে নি।

একটা অসহায় আতঙ্কই তখন প্রধান, কিন্তু তার সঙ্গেই একটা কঠিন অনমনীয় সঙ্কল্পের দৃঢ়তা! নিজেকে কাতর হয়ে লুটিয়ে পড়তে সে দেবে না।

মনে আছে, বাড়ী থেকে সেই প্রথম হাসপাতালে নিয়ে যাবার দিনও সে কাঁদে নি। অন্ততঃ তার চোখে এক ফোঁটা জল অনুপমকে সে দেয় নি দেখতে। দেয় নি অনুপমের জন্যেই।

অনুপমকে কেমন অসহায় দিশাহারা মনে হয়েছিল। মৃত্যুর ছায়াচ্ছন্ন নিজের জীবনের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে যত না দুঃখ হয়েছিল, তার চেয়ে বেশী হয়েছিল অনুপমের নিরুপায় বিমূঢ়তার কথা ভেবে তার প্রতি মায়ায়।

কিন্তু তবু শোভনা কাঁদে নি।

এমন একটা প্রসন্নতা মুখে রাখবার চেষ্টা করেছিল, যেন ক'দিনের জন্যে কোথাও একটু ঘুরে আসতে যাচ্ছে মাত্র।

অ্যাম্বুলেন্সের গাড়ীটা যেন একটা রাজরথ।

স্ট্রেচারে শুইয়ে তাতে নিয়ে গিয়ে তোলা যেন একটা খেলা।

অনুপম কী অসহায় বিমূঢ় ভাবে অ্যাম্বুলেন্স গাড়ীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, শোভনা এখনও যেন দেখতে পায়।

অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভারই অনুপমকে বলেছিল, কই মশাই, আসুন। গাড়ীতে উঠুন। তারপর অনুপম বিহ্বল ভাবে গাড়ীতে উঠতে যেতে আবার বলেছিল, ঘরের দরজাটায় তালা দিয়ে আসবেন না?

শোভনা তখন গাড়ীর ভেতরে স্ট্রেচারে শায়িত। চোখে সে কিছু

দেখতে পায় নি, যা কিছু কানেই শুনেছে, তবু সমস্ত দৃশ্যটা তার যেন দেখা মনে হয়।

মুখে কিছু বলবার সুযোগ ছিল না, কিন্তু মনে মনে বলেছে, তুমি ভেব না, কিছু ভেব না। আমি ঠিক সেরে ফিরে আসব।

হাসপাতালে যাওয়ার ব্যবস্থা স্থির হবার সময় এ কথা অবশ্য মুখেই বলেছিল বার বার। অনুপমকে কত বিষয়েই পাখী-পড়া করে কি করতে হবে না হবে বুঝিয়েছিল।

অনুপমের তখন থেকেই কেমন যেন আচ্ছন্ন অবস্থা। মুখের দিকে নির্বোধের মত নীরবে তাকিয়ে থাকত শুধু।

তখনও শোভনা কাঁদতে পারত, কিন্তু সব কান্না হৃদয়কে যেন পাথর-চাপা দিয়ে সে রুদ্ধ করে রেখেছিল।

সেই পাথর কি করে যে এতদিন বাদে প্রথম সরে গেল, কে জানে!

চোখের জলে মনের অনেক দুঃখ বেদনা গ্লানি নাকি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে যায়।

অনেকক্ষণ বাদে চোখ মুছে বিছানায় উঠে বসে শোভনার কিন্তু তা ঠিক হয়েছে বলে মনে হয় নি। শুধু চোখের জলে ধুয়ে নিজের কাছে নিজের মনটা আর একটু যেন স্বচ্ছ হয়েছে।

সেই অস্থির আবর্ত আর নয়, তার বদলে নিজেকে বিচার করবার একটা প্রশান্তি কিছুক্ষণের জন্যে সে বুঝি পেয়েছে।

বিচার করে যা বুঝেছে তাই থেকেই কি এই জলার রাজ্যে আবার ফিরে আসার নির্বন্ধ?

হয়ত তাই। কিন্তু তার আগে আরও এমন একটি ঘটনা ঘটেছে যা এখানে আসার সঙ্কল্পে সাহায্য করেছে না বাধা দিয়েছে, এখনও শোভনা ভাল করে জানে না।

ঘর থেকে বেরিয়েই নিখিল বক্সীকে উঠোন পার হয়ে চলে যেতে দেখেছে সেদিন।

শুনুন। গভীর দ্বিধা জয় করে শোভনা শেষ পর্যন্ত তাকে ডেকেছে নিজে থেকেই।

নিখিল থমকে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু পিছু ফিরে তাকায় নি পর্যন্ত।

শোভনাকেই গম্ভীর স্বরে আবার বলতে হয়েছে, একটা কথা শুধু শুনে যান।

নিখিল এ ডাক শুনেও কয়েক সেকেণ্ড যে নীরবে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে, শোভনার পক্ষে তা-ই অসহ্য অপমান ও গ্লানি। আশুবাবুর ঘরের সামনে দিয়ে যাবার সময়, পাছে তিনি নিখিলকে দেখতে পেয়ে আগেই কিছু বলে বসেন এই আশঙ্কাতেই শোভনা অবশ্য নিজের প্রথম দ্বিধা জোর করে কাটিয়ে উঠেছিল। এখন কিন্তু লজ্জা ও অনুশোচনা রাখবার যেন তার জায়গা নেই।

নিখিল বক্সী শেষ পর্যন্ত মুখ ফিরিয়ে ধীরে ধীরে শোভনার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

মুখ তার কঠিন কি অপ্রসন্ন নয়, কিন্তু কেমন ক্লান্ত ও কাতর। তার স্বাভাবিক সপ্রতিভ উচ্ছলতা এমন ভাবে লুপ্ত হয়ে যাওয়া যেন অবিশ্বাস্য।

এ পরিবর্তনের কারণ বিশ্লেষণ করবার মত মনের অবস্থা শোভনার নয়। সে শান্ত ও ঈষৎ কঠিন স্বরে বলেছে, আপনার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কোন ভয় নেই। আমি শুধু একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার জন্যে আপনাকে ডাকলাম। স্বার্থটা অবশ্য আমারই, তবে খবরটা আপনার কাছেই পাওয়া বলেই আপনাকে বিরক্ত করতে হচ্ছে। আপনি যে কাজের কথা বলেছেন সেটা আমার পক্ষে পাওয়া কি সত্যিই সম্ভব?

সম্ভব বলেই ত মনে হয়। নইলে মিছিমিছি আপনাকে খবর দিতাম না। কিন্তু এ কাজ এখন আপনার না নেওয়াই ভালো। নিখিলের স্বর শুষ্ক নয় শুধু একটু যান্ত্রিক।

কেন? নিজের অজ্ঞাতসারেই শোভনার কণ্ঠস্বর একটু তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে।

নিখিল বক্সী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বলেছে, খবরটা যখন আমিই এনেছি তখন তার জন্যে ওইটুকু কৃতজ্ঞতার ঋণেও আপনাকে বাঁধা রাখতে চাই না বলে।

কৃতজ্ঞতার বালাই যদি আমার না থাকে! শোভনা পাল্টা আঘাত দেবার জন্যে এর চেয়ে তীব্র কিছু বলার কথা সেই মুহূর্তে খুঁজে পায় নি।

ভাষায় না থাক, স্বরের তীব্রতায় যে জ্বালা ছিল তা কিন্তু সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে নিখিল একটু হেসে বলেছে, আপনার ও বালাই না থাক্, কৃতজ্ঞতার লোভ ত অপরের থাকতে পারে। সে লোভও মনের বাঁধন আলগা করে দেবার পক্ষে অনেক সময়ে যথেষ্ট।

তার মানে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা আপনার নয়। বিদ্রূপ করতে গিয়ে শোভনার কণ্ঠে একটু বিমূঢ় বিস্ময় যেন আপনা থেকে মিশে গেছে।

না, নয়। বলে নিখিল বক্সী আর কিন্তু সেখানে দাঁড়ায় নি।

আকুল কান্নায় মনে যে স্বচ্ছতা কিছুক্ষণের জন্যে অনুভব করেছিল তা এই সাক্ষাতের পরেই অবশ্য দূর হয়ে গেছল।

দ্বিধা-সংশয়ের দোলায় দুলেছিল তার পর থেকেই।

কি সে করবে? একটা চকিত অস্পষ্ট ছবি স্মৃতি থেকে মুছে নিতে পারলেই একদিক দিয়ে সব দোলা বুঝি থেমে যায়।

কিন্তু মুছে দিতে পারবে কি?

জীবনের নিষ্ঠুর দুর্জ্ঞেয় ঘূর্ণি এমন এক জায়গায় তাকে এনে ফেলেছে যেখানে পরের ধাপ নেবার সমস্ত দায়িত্ব তার নিজের।

এবার আর আশুবাবু কি আর কারো হাত দিয়ে ভাগ্যের দাবার চাল নয়। সে নিজেই নিজের এখন নিয়ন্তা।

ইচ্ছে করলে অতীতকে সত্যিই সজ্ঞানে সে এবার মুছে দিতে পারে চিরকালের মত। কেউ কিছু জানে না, জানতে চাইবে না। জবাবদিহি যদি দিতে হয় ত এবার শুধু নিজের অন্তরের কাছে।

অন্তরের মধ্যে সব প্রশ্ন কি এখনো নীরব হয় নি ?

তা যে হয় নি, এই জলার রাজ্যে আবার ফিরে আসাই তার প্রমাণ।

নসুর নির্দেশে সম্পূর্ণ ভিন্ন দিক দিয়ে শোভনা সেই তিন মাথার চরে এসে ওঠে।

জলার মাঝখানে সামান্য একটু উঁচু নাতিপ্রশস্ত খানিকটা শুকনো ডাঙা। তিনটি দুঃস্থ পরিবার তারই মধ্যে কোনরকমে পাশাপাশি বাসা বেঁধে আছে। বাসা নেহাৎ বলতে হয় তাই। কোনরকমে মাথা গোঁজার ঠাঁই। চালের কোথাও ভাঙা মরচে-ধরা টিন, কোথাও ছেঁড়া তেরপল, খড়, কি খোলার অভাব মিটিয়েছে। মুলী-বাঁশও সকলের জোটে নি দেয়াল তুলতে। জানলা বলতে অধিকাংশই ফোকর শুধু। তার গায়ে চটের পর্দা ঝুলছে। দরজার বদলে বাখারি-দরমার আগড়।

তিনটি বাসার মাঝখানের এজমালী উঠোনের মত জায়গাটুকুতে যে গুটি-তিনেক উলঙ্গ শিশু খেলা করছে তারা কিন্তু বেশ হৃষ্টপুষ্টই মনে হয়। ঘরদোর আসবাব পোশাকে যে চরম দারিদ্র্য পরিস্ফুট, বাসিন্দাদের চেহারায় কি মুখের ভাবে তার গ্লানির যেন চিহ্ন নেই। ঘরের নামে যা পরিহাস, তাও বেশ পরিচ্ছন্ন পরিষ্কার। মাটির উঠোন নিকোনো গোঁছানো। যে দু'টি অল্পবয়সী বধূ ঈষৎ ঘোমটা দিয়ে বিস্মিত চোখে শোভনাকে নিজেদের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছে, তাদের দেহে ও মুখে স্বাস্থ্যশ্রীর একেবারে অভাব নেই।

নসু তিন মাথার চরে পৌঁছে দিয়েই তার কর্তব্য শেষ মনে করে ইতিমধ্যে চলে গেছে। যাবার আগে শুধু জিজ্ঞাসা করেছে, এবার আপনি পথ চিনে ফিরে যেতে পারবেন ত ?

শোভনা ঘাড় নেড়ে তাকে আশ্বাস দিলেও নসু তার দায়িত্ব সম্পূর্ণ পালন না করে ছাড়ে নি। দূরে একদিকে হাতের গুলতিটাই তুলে

ধরে বলে গেছে, ওই যে জোড়া খেজুর গাছ দেখছেন, সোজা ওই দিকে মুখ রেখে চলে যাবেন, আর পথ ভুল হবে না তা হলে।

নসু চলে যাবার পর শোভনা বেশ একটু অস্বস্তিই বোধ করেছে, এই অপরিচিতদের মধ্যে একা দাঁড়িয়ে থেকে।

কিন্তু এ অস্বস্তি শুধু নয়, এর চেয়ে অনেক বেশী কিছু দুর্ভোগের সম্ভাবনা জেনেই সে এখানে এসেছে। সুতরাং বিচলিত হলে তার চলবে না।

বধূরা কেউ নিজে থেকে তার সঙ্গে আলাপ করবার চেষ্টা করে নি। শুধু একটু সন্দিগ্ধ ও বিস্মিতভাবে তার দিকে চেয়ে থেকেছে।

উঠোনের ছোট ছোট ছেলেমেয়ে তিনটিও একটু যেন ভয়ে বিস্ময়ে আড়ষ্ট।

কি এখন করা উচিত শোভনা স্থির করতে পারে নি। নিজে থেকেই সে কি আলাপ করবে এদের কারুর সঙ্গে? কিন্তু আলাপ সুরু করবে কি নিয়ে?

এখানে আসার সঙ্কল্প যখন স্থির করেছে তখন এই সমস্যার কথাটা মাথায় আসে নি।

সমস্যাটা কিন্তু আপনা থেকেই মিটে যায়।

একটি শিশু উঠোন থেকে মা'র কাছেই যাবার জন্যে টলতে টলতে কয়েক পা চলে পড়ে গিয়ে কেঁদে ওঠে। শোভনা কিছু না ভেবেই তাকে মাটি থেকে তুলে নিয়ে গায়ের ধুলো ঝাড়বার চেষ্টা করায় একটি বধূ এগিয়ে এসে শিশুটিকে নিজের কোলে টেনে নিয়ে একটু অপ্রসন্ন স্বরেই বলে, থাক্, আপনার হাত নোংরা হবে!

তা হলই বা। বলে একটু হেসে শোভনা এ সুযোগ নষ্ট হতে দেয় না। জিজ্ঞাসা করে, এ সব ছেলেমেয়ে আপনার?

আমার কেন হবে? আমার এইটি। আঞ্চলিক টানের সঙ্গে একটু যেন প্রসন্ন মুখে কথাগুলি বলে বধূটি অপর বধূকে দেখিয়ে দিয়ে জানায়, ও দুটি ছেলেমেয়ে ওই ওর।

আপনারা কতদিন এখানে আছেন ? এ প্রশ্ন করা এর পর সহজ।

আমি এক বছর, আর ওরা তিন-চার বছর হবে। তাই না ?

দ্বিতীয় বধূটিও এবার এগিয়ে কাছে এসেছে। প্রশ্নটা তাকেই।

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে দ্বিতীয় বধূটিই এবার শোভনাকে জিজ্ঞাসা করে, আপনি সেদিন দু'জন বুড়ো মানুষের সঙ্গে এখানে এসেছিলেন না ? ওই ছোকরাটার সঙ্গে ?

শোভনা এ কথা স্বীকার করবার আগেই আবার বধূটি জিজ্ঞাসা করে, যাকে খুঁজছেন সে ত এখানে নেই শুনে গেছেন। আজ আবার এসেছেন কেন তা হলে ?

এসেছি, সে এখানেই আছে জেনে। বলে শোভনা তাদের দিকে চেয়ে একটু হাসে।

তেরো

এখানে আছে জেনে এসেছেন ?

দুজনের মধ্যে বয়স যার একটু বেশী সেই বধূটি বিস্ময়টা প্রকাশ করলেও প্রথমে দুজনেরই কেমন একটু অস্বস্তি দেখা যায়। পরস্পরের দিকে তাদের মুখ চাওয়াচাওয়িটুকুও শোভনার দৃষ্টি এড়ায় না।

বয়স্কা বধূটি তারপর গলায় বেশ একটু ঝঙ্কার দিয়ে বলে, কেমন করে জানলেন এখানে আছে ? এই ত আমরা তিন ঘর এখানে আছি দেখতে পাচ্ছেন। সেদিন যার নাম করছিলেন সে নামের কোন মানুষই এখানে নেই। থাকলে মিথ্যে বলব কেন ? আমরা কি চোর-ছ্যাঁচড়, না জাল-জোচ্চর ?

প্রতিবাদ করবার মত কথা। শোভনা কোন জবাব না দিয়ে তবু নীরব হয়েই থাকে। যা সে চায় তা বাদ-প্রতিবাদে হবার নয়— সে বুঝেছে।

তার নীরবতা কিছুটা সফলও হয়। দ্বিতীয় বধূটি একটু যেন

সহানুভূতির সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করে, যাকে খুঁজছেন সে কে হয় আপনার ?

এ প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেওয়া সেই মুহূর্তে শোভনার পক্ষে একটু বুঝি অস্বস্তিকর হত, কিন্তু বয়স্কা বধূটির ঝাঁজালো ধমকের দরুন সে তখনকার মত রেহাই পায়।

তুই থাম্ ত চপলা। বয়স্কা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, কেউ হয় বলে খোঁজ করতে এসেছে না কি ? শুনলি না এরা সব সরকারের চর। কে কোথায় সরকারী টাকা ফাঁকি দিয়ে নিচ্ছে মিথ্যে নাম ঠিকানা লিখিয়ে, তাই এসেছে খোঁজ করতে। আসল কাজের বেলা অষ্টরম্ভা শুধু ভাল মানুষদের হয়রান করতেই জানে।

চপলাই কিন্তু মৃদু প্রতিবাদ জানায় এবার, আমার কিন্তু তা বিশ্বাস হয় না রাণীদি। সে রকম খোঁজ করতে থানা-পুলিসের লোক আসবে না।

তুই যেমন বোকা গাঁইয়া। রাণীদি চপলার নির্বুদ্ধিতাকে ভৎ'সনা করে বলে, ক'দিন আর এসেছিস যে এখানকার হালচাল বুঝবি ? চেহারা পোশাক দেখে এখানে মানুষ চেনা যায় ? থানা-পুলিসের লোক কি জানিয়ে শুনিয়ে আসে না কি ? কত তাদের ভোল !

চপলা ও রাণীদির আলোচনাটা কোন্ দিকে এর পর যেত বলা যায় না। শোভনাই এবার তাতে বাধা দিয়ে মৃদু হেসে জানায়, আমি সত্যিই থানা পুলিস বা সরকারের কেউ নয় কিন্তু। আমি নিজের গরজেই একজনের খোঁজ করতে এসেছি।

রাণীদি আবার বুঝি কি বলতে যাচ্ছিল, শোভনা তাকে সে সুযোগ না দিয়ে তার পর বলে, আমি যার খোঁজ করতে এসেছি, নিজের চোখে সেদিন তাকে এখানে দেখে গেছি।

নিজের চোখে দেখেছেন ? চপলার গলায় ও মুখের ভাবে বিস্ময়ের চেয়ে কেমন একটা আশঙ্কাই এবার ফুটে ওঠে।

হ্যাঁ। শোভনা শান্ত স্বরে বলবার চেষ্টা করে, সেদিন সেই

বাঁশের পোল পার হবার সময় একবার ফিরে তাকিয়ে তাকে আমি দেখতে পাই। বলতে আমার খারাপ লাগছে কিন্তু আমরা যখন এখানে এসে খোঁজ করছিলাম তখন সে এইখানেই কোথাও লুকিয়ে ছিল বলে সন্দেহ হচ্ছে।

রাণীদি বা চপলা কারুর মুখেই এখন কথা নেই। চপলার মুখ তো রীতিমত বিবর্ণ দেখায়।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কম্পিত কণ্ঠে সে-ই জিজ্ঞাসা করে, আপনি ঠিক দেখেছিলেন তো? সেদিন—সেদিন—

কথাটা শেষ করতে চপলা আর পারে না। আশঙ্কায় আবেগে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে।

শোভনার মনের ভেতরও কেমন করে যেন সব ওলট-পালট হয়ে যায়। এই অচেনা সরল দরিদ্র গ্রাম্য মেয়েটির ভয়-ভাবনার সঠিক কারণ সে জানে না, তবু কি একটা অস্পষ্ট সন্দেহ তীব্র ক্ষণিক বিদ্যুৎময় যন্ত্রণায় সমস্ত হৃদয় যেন বিদীর্ণ করে দিয়ে যায়। মৌন কাতর মুখে সে চপলার দিকে চেয়ে থাকে। তারও কথা বলার শক্তি যেন লোপ পেয়েছে।

এই অস্বস্তিকর স্তব্ধতা রাণীদিই ঝঙ্কার দিয়ে ভাঙে, তোর হল কি চপলা! কোথাকার কে কী বললে না বললে তাতেই চোখে একেবারে অন্ধকার দেখলি?

শোভনাকে উদ্দেশ করে রাণীদি তার পর সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করে, যাকে খুঁজছেন তাকে তো নিজের চোখেই দেখেছেন বলছেন। মানলাম ঠিকই দেখেছেন, কিন্তু থানা পুলিস থেকে যখন আসেন নি তখন এত খোঁজাখুঁজি কিসের জন্যে? কি জন্যে তাকে খুঁজছেন শুনি?

সবচেয়ে কঠিন মুহূর্ত বুঝি এই।

কি জবাব দেবে শোভনা? যা বলা উচিত, যা বলবার দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে আজ এখানে এসেছে, সব কি চপলার মুখের দিকে চেয়েই তার গলায় আটকে যায়?

চপলা তার সন্তানটিকে কোলের কাছে ধরে কাতর বিবর্ণ-মুখে তীক্ষ্ণ-উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছে। সে দৃষ্টিতে মনের মধ্যে দুঃসহ একটা জ্বালার সঙ্গে অসীম একটা করুণাও অনুভব করে শোভনা।

নিজের মনটা স্থির করবার সময় নেবার জন্যেই শোভনা কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে একটু হাসবার চেষ্টা করে বলে, দেখুন, আপনাদের হয়ত মিছিমিছিই বিরক্ত করছি। দূর থেকে এক মুহূর্তের দেখায় হয়ত আমারই ভুল হয়েছে। তাই কি জন্যে খুঁজছি বলার আগে সত্যিই সেদিন এখানে কেউ ছিলেন কি না এবং থেকেও আমাদের সামনে বার হন নি কি না জানতে চাইছি।

রাণীদি ও চপলা দুজনেই এবার কিছুক্ষণ চুপ।

তার পর চপলাই ধীরে ধীরে প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে জানায়, হ্যাঁ, ছিল। আমার স্বামী। সরকারী লোক ভেবে সে আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে চায় নি।

একটা বর্ষার মেঘ কিছুক্ষণ থেকে পূর্ব-দিগন্তটা ঢেকে দিচ্ছিল। এখন দূরে তার বর্ষণও সুরু হয়ে গিয়েছে দেখা যায়। কিন্তু শোভনা বোধ হয় তা দেখতে পায় না। তার সমস্ত দৃষ্টির সামনে সব কিছু অকস্মাৎ যেন তার আগেই ঝাপসা হয়ে গিয়েছে। চপলার শেষ কথাগুলো তার কানে যায় কি না সন্দেহ।

যত চেষ্টাই করুক, তার চোখের দৃষ্টি আর মুখের চেহারায় কিছুই বোধ হয় আর গোপন থাকত না, কিন্তু আকাশের বৃষ্টিই এ যাত্রা তার সহায় হয়। ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টিটা সবেগে তখন তাদের কাছে এসে পড়ে বেশ প্রবল ধারায় পড়তে সুরু করেছে।

শিশুদের নিয়ে রাণীদি ও চপলা তাদের ঘরের দিকে ছুটে যায়। তাদের ডাকে শোভনাকেও একটি ঘরের মধ্যে আশ্রয় নিতে হয়।

ঘর নেহাৎ নামেই। মাথার উপর যেমন-তেমন একটা আচ্ছাদন দেওয়া মাটিলেপা বাঁশ বাঁখারির দেওয়াল ঘেরা একটা খুপরি মাত্র। দারিদ্র্যের সঙ্গে শোভনার ভাল রকমেরই পরিচয় থাকলেও এ রকম বাসায় থাকবার অভিজ্ঞতা তার কখনও হয় নি।

ঘরের নিচু টিন ও খোলা-মেশানো জোড়া-তালি দেওয়া চালের উপর বৃষ্টির একটানা শব্দ শুনতে শুনতে শোভনা কিন্তু এ সব কথা ভাবে না। নিজের মনের সঙ্গে যে কঠিন সংগ্রাম তার তখন চলেছে তাতে বাইরের কোন কিছু তার চোখেই পড়ে নি। এই সঙ্কীর্ণ প্রায় বাতায়নহীন ঘরের আধ-অন্ধকারের জন্যে সে তখন কৃতজ্ঞ। মাটির মেঝেয় একটা জীর্ণ মাদুরের উপর বসে সে কিছুক্ষণ অন্ততঃ নিজের হৃদয়কে শান্ত করবার সময় পেয়েছে।

ঘরে ঢোকার পর শোভনাকে বসতে বলে চপলা কিছুক্ষণ আর তার দিকে মনোযোগ দেবার অবসর পায় নি।

ছাদের যা অবস্থা তাতে বৃষ্টির জল সম্পূর্ণ আটকায় না। যেখানে উপর থেকে জল পড়ে সেখানে কাগজ বা চট গুঁজে ও তাতে বিফল হলে সেখানকার জিনিসপত্র সরিয়ে ছেলেটিকে বিছানায় শুইয়ে ঘুম পাড়াতেই চপলাকে ব্যস্ত থাকতে হয়।

তার মধ্যে হঠাৎ এক সময়ে তার কণ্ঠ শুনে শোভনা চমকে ওঠে।

আমার স্বামীকেই কি আপনি খুঁজছেন ?

শুধু এ প্রশ্নের আকস্মিকতায় নয়, চপলার এ প্রশ্ন করবার ধরনেও শোভনা চমকিত হয়। এ প্রশ্নে উত্তরের কোন প্রবল দাবীই যেন নেই। গলার স্বর যেমন ক্লান্ত করুণ, প্রশ্নের ভঙ্গিও তেমনি বিমূঢ় অসহায়। উত্তরটা জানবার আশঙ্কাতেই প্রশ্নটা যেন ক্ষীণ ও স্তিমিত।

শোভনা আগড় দেওয়া দরজার দিকে মুখ করে বসে ছিল।

মুখ ফিরিয়ে এবার সে চপলার দিকে তাকায়।

বাইরে বৃষ্টির মেঘ আরও গাঢ় হয়ে নেমেছে। ঘরটা বেশ অন্ধকার। মাঝে মাঝে জানলার চটের পর্দা হাওয়ার ঝাপটায় তুলে সরে গিয়ে ঘরের ভেতরকার সে আবছা অন্ধকার কিছুক্ষণের জন্য একটু ফিকে হয়ে আসে।

জীর্ণ বিছানার ওপর চপলার মূর্তিটা সে আলো-অন্ধকারের দোলায় ফুটে উঠতে গিয়ে যেন মুছে মুছে যাচ্ছে।

বাইরে অদূরে কোথায় প্রচণ্ড শব্দে হঠাৎ একটা বাজ পড়ে।

শিশুটি সভয়ে কেঁদে উঠে মাকে জড়িয়ে ধরে। চপলা তাকে বুকে নিয়ে শঙ্কিত ভাবে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে। আর একটা বিদ্যুৎ চমকে চপলার সেই শঙ্কিত স্নেহব্যাকুল মুখ শোভনা এবার স্পষ্ট দেখতে পায়।

সেই মুহূর্তেই বুঝি সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্বের আলোড়ন শেষ হয়ে যায় তার মনে।

চপলার প্রশ্নের পর বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেছে। এখন আর তার কথার উত্তর না দিলেও বুঝি চলে।

কিন্তু শোভনা নিজে থেকেই প্রশ্নটা আবার জাগিয়ে তোলে উত্তরের সব দায় যেন একেবারে চুকিয়ে ফেলবার জন্যে।

আপনার স্বামীরই খোঁজ করছি কি না জিজ্ঞাসা করছেন?

চপলার দিক্ থেকে অস্ফুট একটা শব্দ আসে, হ্যাঁ। তাকে ছাড়া আর কাউকে সেদিন ত দেখবার কথা নয়।

তাহলে তাঁকেই বোধ হয় দেখেছিলাম। তবে আমি যাঁকে খুঁজছি তিনিই আপনার স্বামী কি না এখনও জানি না। চেহারার মিল থাকার দরুন দূর থেকে দেখার ভুলও হতে পারে। এখানকার খবর যার কাছে পেয়েছি সেও হয়ত সেই ভুলই করেছে।

চপলার দিক্ থেকে খানিকক্ষণ কোন সাড়া পাওয়া যায় না।

ধীরে ধীরে মৃদুকণ্ঠে সে তার পর জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু কেন তাঁকে খুঁজছেন ?

কেন ? শোভনা এবার হৃদয়ের চরম পরীক্ষাই দেয়।

একটু হেসে উঠে ব্যাপারটাকে হাল্কা করে দেবার চেষ্টা করে বলে, তেমন গোলমেলে কিছুর জন্যে নয়। আপনার স্বামীই যদি হন তাহলেও ভয়-ভাবনার কিছু নেই। খুঁজছি শুধু একটা ব্যাপারের সাক্ষী হিসেবে।

সাক্ষী! চপলার কণ্ঠে সংশয় ও আশঙ্কার সুরটা শোভনার আশ্বাসেও দূর হয় নি বোঝা যায়।

হ্যাঁ, সাক্ষী। তবে বললাম ত ভয়ের ব্যাপার কিছু নয়।

কি বলবে শোভনা এতক্ষণে কিছুটা স্থির করে ফেলেছে। এবার সে কল্পনার রাশ ছেড়ে দেয়।

চপলাকে সে বোঝায়, একটা উইলের সাক্ষী হিসেবেই সে তার পুরানো একজন প্রতিবেশীর খোঁজ করছে। শোভনার এক নিঃসন্তান মামা যেন মৃত্যুর আগে শোভনাকে তাঁর যা কিছু দিয়ে যাবার উইল করেছিলেন। সে উইলের সাক্ষীদের মধ্যে ছিলেন চপলার স্বামী বা তাঁর মত দেখতে একজন প্রতিবেশী। সবাই ভাড়াটে বাড়ীর বাসিন্দা। কিছু দিন বাদে সেই প্রতিবেশী অন্য কোথায় যে উঠে যান, শোভনা তা জানে না। না জানলেও ক্ষতি কিছু ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি শোভনার মামার অন্য এক আত্মীয় সে উইল মিথ্যে বলে প্রমাণ করবার চেষ্টা করছে। উইলের তখনকার সাক্ষীদের দুজন বৃদ্ধ আগেই মারা গেছেন। একমাত্র সেই তখনকার প্রতিবেশীই তাই শোভনার ভরসা। তাঁকে খুঁজে বার করবার জন্যে তাই তার এত আগ্রহ। তার বিপক্ষদল পাছে সে সাক্ষীর আগে সন্ধান পেয়ে টাকা-পয়সা দিয়ে তাকে সরিয়ে রাখে সেই ভয়েই এমন ভাবে সে ছুটাছুটি করছে।

বানানো গল্পটা শোভনা যখন শেষ করে তখন কল্পনার উদ্বেগেই

বুঝি তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। বাইরের বৃষ্টির বেগ কমে এলেও ঘরটা তখনও অন্ধকার। নইলে শোভনার মুখটা সে মুহূর্তে দেখলে চপলা কি ভাবত কে জানে। হৃদয়কে মিথ্যার শবাধারে সম্পূর্ণ বন্দী করে দিয়ে সে যেন একটা শূন্যতার ছায়ামূর্তি হয়ে বসে আছে।

চপলা শোভনার সব কথা বুঝতে পারে কি না বলা যায় না, কিন্তু ঘুমিয়ে পড়া শিশুকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতেই তার নিরুদ্বেগ নিশ্চিন্ততার একটু আভাস বুঝি পাওয়া যায়।

আভাস পাওয়া যায় চপলার পরের কথাতেও।

সত্যিকার কুণ্ঠার সঙ্গেই সে বলে, বৃষ্টিটা এখনও থামল না। যা আমাদের ঘরদোরের ছিরি, আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে নিশ্চয়।

তা একটু হলই বা! শোভনার গলায় হাসির শব্দই বুঝি শোনা যায়, দিনরাত তোমরা যেখানে থাক সেখানে দু দণ্ড আমি কাটাতে পারি না!

আপনি থেকে তুমিতে নামানটা ইচ্ছাকৃত। এই মেয়েটিকে সম্বোধনের কৃত্রিম দূরত্বে রাখা এখন আর যেন তার পক্ষে অর্থহীন।

চপলা পরিবর্তনটুকু লক্ষ্য করুক বা না করুক, তার ক্ষুণ্ণ হবার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। শিশুর বিছানা থেকে উঠে এসে শোভনার পাশেই বসে পড়ে সে সরল ভাবে বলে, আপনি আজ আবার আসায় সত্যিই কিন্তু ভয় পেয়েছিলাম!

পেয়েছিলে! কিন্তু এখন ত আর ভয় নেই। সুতরাং আমায় আর আপনি নাই বললে!

তা কি হয়! চপলা লজ্জায় কুণ্ঠাতেই হেসে ওঠে, আপনারা লেখাপড়া জানা শহুরে মেয়ে, আমাদের মত মুখ্খু গাঁইয়ার মুখে তুমি শুনলে রাগ করবেন না?

রাগ যদি না করি, তাহলে ত বলতে দোষ নেই। রাগ করার বদলে আমি খুশীই হব।

বেশ, তাহলে বলব। চপলার গলার স্বরে বোঝা যায় সে কৃতার্থ হয়ে গেছে—কিন্তু আপনি, না না তুমি কি আর কখনো এ হাঘরেদের পাড়া মাড়াবে! নেহাৎ আজ গরজ আছে বলে তাই।

আজ গরজে এসেছি ঠিকই। শোভনার গলার স্বরটা গাঢ় হয়ে ওঠে, কিন্তু তুমি যদি আসতে বল তা হলে বিনা গরজেই আসব। তখন আবার বিরক্ত হবে না ত?

বিরক্ত হব! চপলা তীব্র প্রতিবাদ জানায়, কি যে বলেন? না না ভুল হয়েছে। কিন্তু কেনই বা এখানে আবার আসবে? আমরা ত ভাল করে ছুটো কথা বলতেই জানি না।

শোভনা এবার একটু হাসে, আমি ত কথকতা শুনতে তোমার কাছে আসব না। তোমায় ভাল লেগেছে তাই আসব।

বাইরের দিকে আগড়ের ফাঁক দিয়ে একবার দেখে শোভনা তারপর বলে, বৃষ্টিটা থেমেছে মনে হচ্ছে, আমি কিন্তু এখন তাহলে চলি।

এর মধ্যেই যাবে! চপলা সত্যিই ক্ষুণ্ণ হয়ে বলে, কিন্তু বসতেই বা বলি কি করে? ওঁর সঙ্গে দেখা হলে একটা যা হোক মীমাংসা হয়ে যেত। কিন্তু উনি ত সেই রাত্রের আগে ফিরবেন না!

অনেক রাত করে ফেরেন বুঝি? প্রশ্নটা নিজের অজ্ঞাতসারেই শোভনার মুখ দিয়ে বুঝি বেরিয়ে যায়। তাড়াতাড়ি তাই সেটা চাপা দেবার জন্যে সে আবার বলে, কিন্তু রাত পর্যন্ত বসে থাকা ত আমার চলবে না। আমি বরং আর একদিন আসব।

হ্যাঁ, তাই আসবে। খুব সকাল সকাল কিন্তু। এক পহর বেলা না হতেই বেরিয়ে যায় কিনা! আগড়টা ঠেলে শোভনার সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এসে চপলা উৎসাহের সঙ্গে বলে, কাল যদি আস তাহলে খুব ভাল হয়। আমি অবশ্য আজই সব কিছু বলে-কয়ে বুঝিয়ে রাখব।

কি বুঝিয়ে রাখবে? শোভনা হেসে না জিজ্ঞাসা করে পারে না।

তোমার উইলের কথা জানিয়ে, মিথ্যে ভয়ের কিছু নেই তাই বুঝিয়ে রাখব। কে জানে উনিই হয়ত তোমার উইলের সাক্ষী ছিলেন। বিয়ের আগে উনি কোথায় ছিলেন না ছিলেন কিছু ত জানি না।

শোভনা প্রাণপণে কণ্ঠটাকে সহজ স্বাভাবিক রাখবার চেষ্টা করে জিজ্ঞাসা করে, কতদিন তোমাদের বিয়ে হয়েছে?

কতদিন! চপলাকে বেশ একটু ভাবতে হয়, সেই দেশ থেকে পালিয়ে ক্যাম্পে এসে ওঠার পরই। তা এই দু শীত আর ক'মাসে এই—এই প্রায় আড়াই বছর হল।

আড়াই বছর? মুখে নয় বুকের ভেতরই একটা জ্বলন্ত জিজ্ঞাসা নিয়ে শোভনা কিছু আর না বলে নসুর নির্দেশ দেওয়া সেই জোড়া খেজুর গাছের দিকে এবার চলতে সুরু করে।

বৃষ্টি থেমে গিয়ে চারিদিক ধোয়া-মোছা হয়ে ঝলমল করছে। প্রকৃতির এ উজ্জ্বলতা যেন তার হৃদয়েরই প্রতি বিদ্রূপ।

কিছুদূর যেতে যেতেই পেছন থেকে রাণীদির গলা শুনতে পায়। বৃষ্টি থামবার পর বেরিয়ে এসে চপলার কাছে শোভনার আসার উদ্দেশ্য সে বুঝি ইতিমধ্যেই একটু শুনেছে।

তার তীক্ষ্ণ অবিশ্বাসের স্বর এতদূর পর্যন্ত কিছুটা এসে পৌঁছোয়।

তুই যেমন হাবা গাঁইয়া! ওদের কথা কখনও বিশ্বাস করতে আছে? ওরা কলকাতার শহুরে মেয়ে ভাজছে উচ্ছে ত ওরা বলবে পটল।

চোদ্দ

কত বছর বলেছে চপলা?

আড়াই বছর। প্রায় আড়াই বছর হল তাদের বিয়ে হয়েছে।

মনের অন্য সমস্ত চিন্তা-ভাবনাকে নীরব করে দিয়ে এই আড়াই বছর কথাটাই যেন ঘুরে ঘুরে অর্থহীন ভাবে অনেকক্ষণ বেজে চলে।

এই আড়াই বছর বলতে কি সে বুঝেছে তাও তার কাছে প্রথমটা স্পষ্ট হয় না। তার মন যেন এই শব্দটার অসহ্য ঝঙ্কার এড়িয়ে পরের চন্তায় পৌঁছোতে পারছে না।

অনেকক্ষণ বাদে মনটা একটু একটু বুঝি থিতিয়ে আসে।

তখন ট্রামের মেয়েদের একটি সীটে সে একা বসে আছে। জলার রাজ্যের তিন মাথা চর থেকে বেরিয়ে সে বাসায় ফেরবার পথই ধরেছিল। কিন্তু অনেক দূর আসার পর ট্রাম-রাস্তায় পড়ে সামনে একটি ট্রাম থামতে দেখে তাতেই উঠে বসেছে।

অফিস যাওয়া-আসার সময় নয়, ট্রামটা তাই একটু ফাঁকা। মেয়েদের একটি সীটে সে একাই বসতে পেয়েছে।

জানলা দিয়ে বাইরের দিকে সে তাকিয়ে। ট্রামটা চলেছে ঘিঞ্জি শহরতলীর সঙ্কীর্ণ রাস্তা দিয়ে থমৃকে থমৃকে অনতিদ্রুত গতিতে।

কিন্তু বাইরের পথ-ঘাট নয়, তার চোখের ওপর ভেসে চলে যাচ্ছে অন্য আর এক জগৎ।

আড়াই বছর! না, আড়াই বছর নয়—তারও আগে প্রায় চার বছর আগেকার কথা মনে পড়ছে। চার বছর আগেই প্রথম হাসপাতালে তাকে নিয়ে গিয়ে তোলা হয়েছিল।

চপলার হিসেব যদি ঠিক হয় তা হলে অনুপম দেড় বছরের বেশী অপেক্ষা করতে পারে নি।

আড়াই বছর আগে হাসপাতালের রোগ-শয্যায় শুয়ে সে কি কোন আভাস কোথাও পেয়েছিল?

সেই সময়কার দিনগুলো শোভনা মনে করবার চেষ্টা করে। ঠিক স্পষ্ট মনে পড়ে না। সমস্ত হাসপাতালের জীবনটা, বিশেষ করে প্রথম কয়েকটা বছর যেন একটা এলোমেলো ভাবে মেশানো ছবির জটলা হয়ে আছে তার মনে। কোন্‌টা আগে কোন্‌টা পরে ভাল করে আলাদা করে নেওয়া যায় না।

তবে হ্যাঁ, প্রায় আড়াই বছর আগেই ত সেই সঙীন অবস্থা দেখা

দিয়েছিল। হাসপাতালে গিয়ে কিছুদিন বাদে যে উন্নতির লক্ষণটুকু দেখা গেছল, হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে তা গেছল উলটে। চড়াই বেয়ে একটু একটু করে নিরাময়তার দিকে উঠতে উঠতে কোন্ অজানা আঘাতে সবেগে গড়িয়ে পড়েছিল নিচের দিকে।

ডাক্তার নার্স কেউ তাকে কিছু অবশ্য জানায় নি। কিন্তু সে তাদের ধরন-ধারণ দেখেই বুঝেছিল, তার সম্বন্ধে কোন আশা আর তাদের নেই বললেই হয়।

ডাঃ মল্লিক মানুষটাই ছিলেন শীতের দিনে এক ঝলক রোদের মতন। বেডের পাশে এসে বসলেই মনে হত, যেন একটা স্নিগ্ধ আশ্বাসে সমস্ত দেহ-মন চাঙ্গা হয়ে উঠল। তিনি যে খুব সুরসিক বাক্যবাগীশ-গোছের মানুষ, তা নয়। বেঁটে মোটাসোটা-গোছের চেহারা মাথাটার প্রায় সবটাই টাক। দু-চার গাছা কাঁচা-পাকা চুল তাতে যেন এখানে-ওখানে আঠা দিয়ে কেউ লাগিয়ে দিয়েছে। শাদা জিনের প্যাণ্ট আর গলাবন্ধ কোটটা এত আঁট যে, বসতে গেলে মনে হত ফেটে যাবে।

বেডের পাশে এসে বসে তিনি কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে শুধু চেয়ে থাকতেন। তাঁর ভারী মাংসল মুখে কোনরূপ রেখা না ফুটলেও চোখ দুটি কেমন যেন হাসছে মনে হত।

পরীক্ষা করে চার্ট দেখে নার্সের সঙ্গে একটা দুটো কথা বলে তিনি যাবার সময় প্রতিবারই একটি মামুলী রসিকতা করে যেতেন। রসিকতা নয়, তার অক্ষম চেষ্টা বলা উচিত। কিন্তু সেই খোঁড়ানো রসিকতার চেষ্টার পেছনে তাঁর মমতা-কোমল মনটা যেন স্পষ্ট দেখা যেত।

কি বলতেন ডাঃ মল্লিক ?

যেন গম্ভীর হবার ভান করে নার্সকেই বলতেন—কালই নাম কেটে এ বেড খালি করে দেবে, বুঝেছ! অসুখের ভান করে হাসপাতালের অন্ন ধ্বংস করা আর চলবে না।

কথাটা শেষ করে ডাঃ মল্লিক আর সেখানে দাঁড়াতেন না।

ঐ একটি ছাড়া নতুন কোন রসিকতা ভাববার ক্ষমতা ডাঃ মল্লিকের বোধ হয় ছিল না। থাকলে রোগী, রোগিনীদের কেউ অত খুশী হত না বোধ হয়। এই পুরানো বস্তা-পচা রসিকতাটা শোনবার জন্যেই শোভনা উৎসুক হয়ে থাকত প্রতিবার।

ডাঃ মল্লিক যাবার সময় এই রসিকতাটুকু করতে যে-দিন ভুলে গেছলেন, সেদিনটার কথা শোভনার মনে আছে ভালো করেই।

নিজের অবস্থা যে ক্রমশঃ খারাপের দিকে যাচ্ছে তা সে টের পেয়েছিল আগেই। ক'দিন ক'রাত্রি ঘুমতে পারে নি কাশির ধমকে। জ্বর একবারের জন্যেও ছাড়ে নি।

ডাঃ মল্লিকের রসিকতা ভুলে যাওয়া থেকে যেটুকু বুঝতে বাকি ছিল তা পূরণ হয়ে গিয়েছিল সুবাসীর আবদারে।

সুবাসী চাষীর ঘরের হাবাগোবা একটি মেয়ে। ছেলেবেলায় বিধবা হয়ে ভাইয়ের সংসারে লাথি-ঝাঁটা খেয়ে দাসীবৃত্তি করত। সেইখানেই এই সর্ব্বনাশা অসুখে ধরে। গাঁয়ের একজন মাতব্বর কি ভাবে কাকে ধরে-করে এই হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন। সুবাসী সেরে উঠে আর কোথাও যাবার জায়গা না পেয়ে এইখানেই থেকে গেছে। হেঁসেলে কাজ করে আর সময় পেলে রুগীদের সঙ্গে গল্পগাছা করে যায়।

নেহাৎ বোকাসোকা গাঁইয়া ভাল মানুষ। তাকে নিয়ে অনেকে একটু মজাই করে। কেউ কেউ আবার বিরক্ত হয়ে তাড়িয়েও দেয়।

বিরক্ত হবার কারণ আছে। নির্বোধ সুবাসীর গল্পগুলো অনেক সময় একটু অস্বস্তিকর। অনেক দিন ধরে এ হাসপাতালের কোন্ বেডে কে এসেছে, গেছে, সব তার জানা। এই হাসপাতালে এসে যারা আর ফেরে নি তাদের গল্পও সে নির্বিকার ভাবে যখন করে যায় তখন অনেকেই খুব খুশী মনে তা শুনতে পারে না। বিশেষ করে তাদের কারুর কারুর কাছে পাওয়া এটা-সেটা বখশিশের জিনিস যখন

সে গর্ব ভরে দেখায়! কে তাকে, আর বাঁচবে না জেনে, হাতের আংটি দিয়ে গেছে, কার কাছে সে একটা মনিব্যাগ পেয়েছে, কার কাছে শাড়ি কি ব্লাউস, সব সবিস্তারে শুনতে ও দেখতে ঐ একই নিয়তির খড়্গ যাদের ওপর ঝুলছে তাদের আর কজনের ভালো লাগতে পারে।

কিন্তু সুবাসীর এই সব সংগ্রহই একটা অবোধ নেশা। তার ছায়াচ্ছন্ন মনে মৃত্যুর মানে সে কি ভাবে বোঝে কে জানে, কিন্তু সে বিষয়ে তার নির্লিপ্ততা প্রায় দার্শনিক।

এই সুবাসীই ডাক্তার মল্লিকের ঐ ব্যাপারের দিন দুই পরে বিকেলের দিকে দেখা করতে এসে কথায় কথায় হঠাৎ বলেছিল—তোমার দুল জোড়া কিন্তু আমায় দিতে হবে দিদিমণি।

কেন? অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করেই শোভনার বুকের ভেতরটা হঠাৎ যেন হিম হয়ে গেছল!

এই সুবাসীও কি তা হলে জেনে ফেলেছে যে, কোন আশা আর তার নেই!

শোভনার মুখে রোগের পাণ্ডুরতার ওপর যদি আরও কোন ছায়া পড়ে থাকে ত সুবাসীর তা লক্ষ্য করবার কথা নয়। সে নির্বিকার ভাবে বলেছে—এমনি আমি চেয়ে রাখলাম, তোমার খুশি হয় দিও।

সে কানের দুল সুবাসীকে দিতে হয় নি। দেবার কোন বাসনাই ছিল না।

মনে মনে সেই দিনই সঙ্কল্প করেছিল, সবাই আশা ছাড়লেও সে ছাড়বে না, আর মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রামের কঠোর নির্মম বাস্তবতাকে কোন ভাবালুতার বাষ্পে ঝাপ্‌সা করে রাখবে না নিজের কাছে। তা পেরেছিল কি সম্পূর্ণ ভাবে?

অনুপমের জন্যে ভাবনাটাই এক-এক সময়ে নিজের সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণাকে ছাপিয়ে উঠত।

এত অকর্মণ্য অসহায় একটা মানুষ, সংসারে যে শুধু ভেসেই বেড়াবে, সে যদি না সেরে ওঠে।

অনুপম তখনই কি আসা-যাওয়া একটু কমিয়ে এনেছে?

এই সুবাসীই অন্ততঃ একদিন কথাটা তুলেছিল।

হ্যাঁ দিদিমণি, তোমার ওই উনিকে আজকাল আর দেখি না কেন গো!

তোর সঙ্গে কি দেখা করতে আসে যে দেখবি? একটু বিরক্ত হয়েই বলেছিল শোভনা, এই ত সেদিন এসেছিল। রোজ রোজ এতদূর আসা যায়!

সুবাসীর ওপর রাগ করে দেওয়া জবাবটায় নিজের মনকে স্তোক দেবার চেষ্টাই ছিল বোধ হয়।

তার পর কিছুদিন আর কিছু ভাববার মত অবস্থাই ছিল না।

ক'টা পাঁজরা কেটে বাদ দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল ডাঃ মল্লিকেরই শেষ চেষ্টায়। ডাক্তারদের কাটা-ছেঁড়ায় কোন ত্রুটি বোধ হয় হয় নি, কিন্তু সে-ধাক্কা সামলে ওঠার মত জীবনীশক্তিই তার যেন ফুরিয়ে গিয়েছিল।

অনেক—অনেকদিন বাদে অনুপমকে দেখেছিল বিছানার পাশে বসে থাকতে।

সে কতদিন আগের কথা? না, আড়াই বছর নয়।

কিছু কি বুঝতে পেরেছিল তার মুখের দিকে চেয়ে? না, কিছুই না। অনুপমকে কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত লেগেছিল। সে যেন শোভনাকে চিনতে পারছে না, বিশ্বাস করতে পারছে না শোভনাই তার সামনে শয্যার সঙ্গে মিলিয়ে শুয়ে আছে।

না, স্মৃতিকে ঠিক বিশ্বাস করা যায় না এই জায়গাটায়। এখন যা জেনেছে, তাই যেন তখনকার স্মৃতির ওপর ছায়া ফেলেছে।

অনুপমকে একটু অন্য রকম কিন্তু সত্যিই লেগেছিল মনে আছে।

জিজ্ঞাসা করেছিল শোভনা, বড্ড ভয় পেয়েছিলে, না?

অনুপম কোন জবাব দেয় নি। কেমন কাতর অসহায় ভাবে চেয়েছিল শুধু।

শোভনাই আবার বলেছিল—আর ভয় নেই। এবার সেরে উঠব।

সেরে উঠতে তবু আরও অনেকদিন লেগেছিল। অনুপমের দেখতে আসার মধ্যে তখনই বড় বড় ফাঁক পড়ছে।

মুখে একটু-আধটু অভিমান জানালেও মনে মনে শোভনার কোন সত্যিকারের ক্ষোভ বোধ হয় ছিল না। অনুপমের হয়ে সে নিজেই কৈফিয়ৎ দিয়েছে নিজেকে। রোজগারের ধান্দায় ঘোরবার পর অবসর যদি বা মেলে, রোজ রোজ এই রেলভাড়া করে আসা কি অনুপমের পক্ষে সম্ভব?

কিন্তু অনুপম ত তখন থেকেই আসা বন্ধ করতে পারত? তখন চপলার সঙ্গে সে ত যেখানে হোক্ ঘর বেঁধেছে।

যত দেরী করেই হোক, কেন তবু আসত অনুপম? তার বিবেকে বাধত বলে? বিয়ে করবার সময় এ বিবেক কি অসাড় হয়েছিল? না চপলার ওপর এমন দুর্বার তার ভালবাসা যে, কোন বাধা মানে নি মন!

কিন্তু দুর্বার কোন আবেগের স্রোতে ভাসবার মানুষ হিসেবে অনুপমকে সে যে কিছুতেই ভাবতে পারে না।

চপলা আর অনুপমের দেখা হওয়া থেকে বিয়ে পর্যন্ত সমস্ত অধ্যায়টার ওপর কল্পনায় কত ভাবেই না মনটাকে ঘুরিয়ে আনা যায়। অসহায় উদ্বাস্তু নিরাশ্রয় একটি মেয়ে চপলা। হয়ত অনুপমের নিজেদের গাঁয়ের কিংবা দেশের হতে পারে। প্রাণ ইজ্জত ধর্ম বাঁচাতে নিরুপায় হয়ে সব কিছু ছেড়ে এসে সরকারী সাহায্য-শিবিরে আশ্রয় নেবার পরই হয়ত অনুপমের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তার পর মায়া মমতা থেকে ঘনিষ্ঠতা আর ভালবাসা কি? না অসতর্ক মুহূর্তের কোন দুর্বলতার দাম দিতে এ বিয়ে অনুপমকে করতে হয়েছে?

কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষা না থাক্, সরল ও গ্রাম্য হোক, চপলার মধ্যে কিছু এমন আছে বলে মনে হয় যা ওই ধরনের অনুমানের সঙ্গে খাপ খায় না। মেয়েটির মধ্যে একটি স্নিগ্ধ অকৃত্রিম পবিত্রতা যেন আপনা থেকে ফুটে বার হয়।

তা হলে আর সকলের মত অনুপমও কি শোভনা আর বাঁচবে না বলে ধরে নিয়েছিল? তাই যদি নিয়ে থাকে তা হলে মৃত্যুর জন্যে ক'টা দিন অপেক্ষা করার ধৈর্যও তার হয় নি?

কিন্তু সকলের আশা-আশঙ্কাকে মিথ্যে প্রমাণ করে বেঁচে ওঠার পরও অনুপম কেন যে আবার দেখা করতে না এসে পারে নি, কেন যে একটা মিথ্যা নির্মম অভিনয় আরও দীর্ঘকাল অকারণে টেনে নিয়ে গিয়ে হঠাৎ তাতে যবনিকা টেনেছে, এ প্রশ্নের মীমাংসা বুঝি আর কোনদিন হবে না।

শোভনার ভাবনায় ছেদ পড়ে।

কণ্ডাক্টার টিকিটের জন্যে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। শোভনা ব্যাগ খুলে একটা টাকা তার হাতে দিতে সে জিজ্ঞাসা করে নিয়মমাফিক—কোথায় যাবেন?

শোভনা তার গন্তব্য জায়গা জানাবার পর কণ্ডাক্টার টাকাটা ফেরৎ দিয়ে বলে, পরের স্টপে নেমে যান। এ ট্রাম হাওড়া যাচ্ছে।

হাওড়া? শোভনা সত্যিই অপ্রস্তুত হয়। বিচলিত অবস্থায় সত্যিই কিছু না দেখে সে ট্রামটায় উঠে পড়েছে। কিন্তু পরের স্টপে নেমে অন্য ট্রাম ধরতে তার ইচ্ছে করে না। টাকাটা আবার কণ্ডাক্টারকে ফিরিয়ে দিয়ে হাওড়ারই একটা টিকিট সে চায়।

হাওড়ার টার্মিনাসে নেমে স্টেশনের ভিতরকার ভিড়ের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে এদিক-ওদিক একটু ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ হাওড়া আসবার খেয়াল কেন যে তার হল, শোভনা ভাববার চেষ্টা করে। হয়ত মনের এই অবস্থায় একটু দূরের পাল্লাই তাকে আকৃষ্ট করেছে কিংবা তার মন এমনি ভিড়ের মধ্যেই হারিয়ে যেতে চেয়েছে কিছুক্ষণ।

মাঠ পাহাড়ে নয়, নিজেকে হারিয়ে ফেলতে হলে জনতার মত এমন সুবিধে আর কোথাও নেই, বিশেষ করে সে জনতা যদি এ যুগের বড় স্টেশনের মত অসংলগ্ন বিচ্ছিন্ন অসংখ্য সত্তার একটা অস্থির

অস্থায়ী সমষ্টি হয়। স্টেশনে সবাই বিচ্ছিন্ন অসংলগ্ন বটে কিন্তু উদ্দেশ্যহীন নয়। প্রত্যেকের এক-একটি ভিন্ন উদ্দেশ্যের সুতো যেন কিছু ক্ষণের জন্যে এখানে জট বেঁধে আবার খুলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে।

বেলা এখন দুপুর, তবু ট্রেনের যাত্রীর ভিড়ের কামাই নেই। স্টেশনের বড় হলের ঢালাও মেঝের ওপর—এখানে-ওখানে নানা ছোটখাট দল কিছু ক্ষণের সংসার পেতে বসে গেছে। তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট-ঘরগুলোতে এখনও সার দিয়ে লোক দাঁড়িয়ে। এদের প্রত্যেকে কোথাও থেকে এসে কোথাও যাবার জন্যে উৎসুক। যার যার জীবনের একটি একটি কক্ষ আছে—আছে একটা কেন্দ্র, যা তাদের সমস্ত চলাফেরা, ভাবনা-চিন্তা, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের সীমানায় ধরে রেখেছে!

আর তার?

হ্যাঁ আছে, আশুবাবুর স্নেহের আশ্রয়ে ফিরে গিয়ে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করার চেষ্টা কিংবা এ নিরাপদ বৃত্ত কেটে বেরিয়ে নিখিল বক্সীর প্রস্তাবমত স্বাধীন চাকরির জন্যে উমেদারি করা।

সে চাকরিই, ধরা যাক্, সে পেল। তার পর?

তার পর আর একটু ভালো পোশাক, প্রসাধন, ছোটখাট সখ মেটাবার মত সচ্ছলতা, আশুবাবুর এ আশ্রয় ছেড়ে নিজের একটা ছোটখাট বাসা কিংবা মেয়েদের কোন নামকরা হোটেলে অন্ততঃ একটা সীট, নতুন কিছ বন্ধু, ব্যস্।

সে জীবনেরও সত্যকার কোন কেন্দ্র থাকবে কি? তাই যদি না থাকে তা হলে একবার কেন্দ্রহীন হয়ে ছিট্‌কে বেরিয়ে গেলেই বা ক্ষতি কি?

মেয়ের বদলে ছেলে হলে, টিকিট-ঘরে গিয়ে একটা দূর কোন স্টেশনের টিকিট কিনে ট্রেনে চড়ে বসতে পারত না কি অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অন্ধকারে ঝাঁপ দেবার জন্যে?

অজানা কোন শহরে গিয়ে নামত। যখন যেখানে যা জোটে তাই

খেয়ে, যেখানে সুবিধে একটু হয় সেখানেই রাতের বিশ্রামটুকু সেরে, ভাগ্যের সঙ্গে যুঝে দেখতে পারত। দেখতে পারত নিজস্ব একটি জীবনের বৃত্ত রচনা করতে পারে কি না।

কিন্তু মেয়ে বলে সে উপায় তার নেই। যে কোন অজানা জায়গায় সে গিয়ে নামতে পারবে না, পারবে না বেপরোয়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চের ওপর শুয়ে রাত কাটাতে, নিজের উপর যতখানি বিশ্বাস আর যতখানি সাহসই তার থাক না কেন ?

ইতিমধ্যে তার বয়সের একটি মেয়েকে একলা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে স্টেশনের ব্যস্ত জনতার মধ্যে কিছু কিছু যে কৌতূহলের পরিচয় পাওয়া গেছে তা সবই সুস্থ বোধ হয় নয়।

একজন আধা-বয়সী ভদ্রলোক গায়ে পড়ে এসেই বলেছেন, আপনি কোথায় যাবেন ?

শোভনা ঈষৎ ভ্রূকুটির সঙ্গে মুখ তুলে তাকাতে ভদ্রলোক তেমন কিছু অপ্রস্তুত না হয়েই বলেছেন, বলছিলাম, লোক্যালে যদি যেতে চান তা হলে টিকিট-ঘর ওদিকে। মেয়েদের আলাদা কাউণ্টারও আছে।

ভদ্রলোক এইটুকু জানিয়েই চলে গেছেন। হয়ত সাহায্য করবার সদিচ্ছাই তাঁর ছিল। অন্য ধরনের কৌতূহল থাকলেও খুব দোষ দেওয়া যায় না। একা একটি যুবতী মেয়েকে উদ্দেশ্যবিহীন স্টেশনে ঘুরতে দেখেও একেবারে উদাসীন নির্বিকার থাকবে, সংসারের সবাই এমন ঋষ্যশৃঙ্গ এখনও নিশ্চয় হয়ে যায় নি।

ভদ্রলোকের উপদেশ শুনে নয়, এক জায়গায় বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার বিপদ বুঝেই শোভনা লোক্যাল ট্রেনের টিকিট-ঘরগুলোর দিকেই এগিয়ে যায়।

একটা লোক্যাল সবে এসে দাঁড়িয়েছে। জনতার স্রোত প্ল্যাটফর্মের ওপর দিয়ে সবেগে বয়ে যাচ্ছে বাইরের গেটের দিকে।

হঠাৎ শোভনাকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়। বুকের স্পন্দন যেন তার এক মুহূর্তের জন্যে থেমে গিয়ে আবার উন্মত্ত হয়ে ওঠে।

লোক্যাল ট্রেনের আগন্তুক যে যাত্রীর দল স্টেশনের পুব দিকের তোরণ দিয়ে বাইরে যাচ্ছে তাদের দিকে চেয়ে সে যেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারে না।

নিয়তি কি এই জন্যেই আজ তার মনে এই হাওড়া স্টেশনে চলে আসার হঠাৎ খেয়াল তুলেছে!

চিৎকার করে নাম ধরে ডাকা যায় না। যথাসাধ্য তাড়াতাড়ি শোভনাও গেটের দিকে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু মেয়ে হয়ে এই বেশীর ভাগ পুরুষের ভিড়ে ঠেলাঠেলি করে ত যাওয়া যায় না? শোভনাকে একটু সংযত ভাবেই অগ্রসর হতে হয়। যার কাছে পৌঁছবার জন্যে এই ব্যাকুলতা, তাকে মানুষের ভিড়ে সামনে আর দেখাই যাচ্ছে না। তবে গেট থেকে সময়মত বেরুতে পারলে ধরা যাবে নিশ্চয়।

তার আগেই পাশ থেকে বাধা পড়ে।

এ কি, আপনি? এখানে কোথায় এসেছিলেন?

শোভনা ফিরে তাকিয়ে দেখে নিখিল বক্সীই তার পিছু পিছু ভিড়ের ভেতর দিয়ে আসছে।

বাইরের গেটের প্রায় কাছাকাছি তখন তারা পৌঁছে গেছে। ভিড়কে পথ ছেড়ে দেবার জন্যে গেটের পাশের ফুটপাথে তাদের সরে দাঁড়াতে হয়।

নিখিল একটু কুণ্ঠিত ভাবে কৈফিয়ৎ স্বরূপ বলে, মাপ করবেন। আচম্‌কা এখানে আপনাকে দেখে প্রতিজ্ঞাটা ভুলে গেছি।

শোভনা উত্তর দেয় না। সে তখন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারিদিকের জনতার ওপর চোখ বুলিয়ে যাচ্ছে। এদিকে ওদিকে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে সে মুখ ফিরিয়ে একটু ম্লানভাবে হাসে। তার পর বিষণ্ণ কৌতুকের সঙ্গে বলে, আপনি নিয়তি মানেন?

প্রশ্নটা এই পরিবেশে, এই অবস্থায় নিখিল বক্সীর কাছে সত্যিই একেবারে অপ্রত্যাশিত ও অদ্ভুত।

তার বিমূঢ়তাটুকু অগ্রাহ্য করেই শোভনা আবার বলে যায়, নিয়তিই আজ আপনাকে প্রতিজ্ঞা ভুলিয়েছে। কেন জানেন? আমার নিরুদ্দেশ স্বামীকে একেবারে চোখের সামনে এনে আবার লুকিয়ে ফেলার কৌতুক করবার জন্যে। আপনি পিছু না ডাকলে আমি হয়ত আজ তাঁকে একা ধরতে পাবার সুযোগ পেতাম।

আপনার স্বামীর কথা বলছেন! নিখিলের গলায় উত্তেজনা ও বিস্ময় মেশানো, তিনি কোথায়? বলুন, আমি···

বাধা দিয়ে শোভনা বলে, আর আপনার কিছু করবার নেই। চিরকালের মতই তাঁকে হারিয়ে যেতে দিলাম।

পনেরো

স্থির একটা সঙ্কল্পের পর মনটা কি কিছুক্ষণের জন্যে ভারহীন শিথিল হয়ে যায়?

শোভনার অন্ততঃ তাই মনে হচ্ছে। মস্ত বড় একটা বোঝা সে যেন নিজের অজান্তেই বয়ে বেড়াচ্ছিল। এই সঙ্কল্পের সঙ্গে সঙ্গে সে বোঝা নেমে গেছে একেবারে। এতদিন বাদে নিজেকে সত্যিই মুক্ত মনে হচ্ছে।

দুজনে একটা টেবিলে এসে বসেছে।

চারিধারে আরও অজস্র টেবিল-চেয়ার ছড়ানো। একটাও খালি নেই। লোকজন এসে জায়গা না পেয়ে ফিরে যাচ্ছে। 'বয়'দের ছোটাছুটি, ব্যস্ততা। টেবিলে টেবিলে যারা ভীড় করে আছে তাদের সম্মিলিত একটা বিচিত্র কলরবই যেন তাদের ঘিরে রাখার একটা নির্জনতার আবরণ।

একটা ছোট টেবিলে দুজনে যে জায়গা পেয়েছে এটাও ভাগ্য। দু'কাপ চা চেয়ে বহুক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছে। বিরক্ত হওয়ার বদলে এ বিলম্বে শোভনা অন্ততঃ খুশি। জনতার মাঝখানে এমনি

নির্জনতায় যতক্ষণ সম্ভব সে বসে থাকতে চায়। একলাও নয়। সামনে আর একজন কেউ থাকা দরকার যাকে উপলক্ষ্য করে নিজের সঙ্গে কথা বলা যায়। নিখিল বক্সীর বদলে আর কেউ সঙ্গী হলে হয়ত ক্ষতি ছিল না। কিন্তু নিখিল বক্সীই ভালো। নিখিল বক্সী তার প্রতি আকৃষ্ট এ কথা প্রথম জানবার পর যে বিস্মিত অস্বস্তি-মেশানো বিরাগ তার মনে জেগেছিল, তা আর এখন নেই। নিখিলের সেই মুগ্ধতায় সাড়া না দিক তাতে বিরূপতা অন্ততঃ আর জাগছে না। সত্যি কথা বলতে গেলে অনুরাগের উত্তাপটুকু ভালোই লাগছে। তার কারণ বোধ হয় এই যে, নিখিল মুগ্ধ হলেও মূঢ় ভক্ত নয়। মোহ বা আকর্ষণ যেমন তীব্রই হোক্, নিজের কঠিন দূরত্ব সে রাখতে জানে। নিখিলের মত একাধারে চেনা ও অচেনা, দূর ও নিকট একজন সঙ্গীই তার এখন বুঝি সবচেয়ে দরকার ছিল।

হাওড়া স্টেশনের এই জনবহুল রেস্তোরাঁটিতে এসে বসা ঠিক আকস্মিক নয়। শোভনাই নিজে থেকে এখানে আসবার প্রথম ইঙ্গিতটুকু দিয়েছিল।

পলাতক স্বামীকে চিরকালের মত হারিয়ে যেতে দেবার কথা শোভনা তীব্র কঠিন স্বরে বলে নি, কিন্তু হতাশ কোন ম্লান হাসিও তার মুখে ছিল না। তার বদলে যে বিষণ্ণ কৌতুকের আভাস তার মুখে দেখা গিয়েছিল তাইতেই যেন তার সঙ্কল্পের তীক্ষ্ণতা আরও ফুটে উঠেছে।

নিখিল তার দিকে চেয়ে একটু বিমূঢ় ভাবেই চুপ করে ছিল। চুপ করে ছিল শুধু বলবার কোন কথা খুঁজে পায় নি বলে নয়, এর পর তার কি করা উচিত তা স্থির করতে না পারার দ্বিধা সংশয়েও। আকস্মিক এই নাটকীয় মুহূর্তের সাক্ষাৎ শেষ হবার পর অনায়াসে সে চলে যেতে পারে। কিন্তু সেই বিদায় নেওয়াটাকে সহজ করবার মত কোন ভঙ্গি বা কথা সে খুঁজে পায় নি।

শোভনাই তাকে এ সমস্যা থেকে মুক্তি দিয়েছিল।

জিজ্ঞাসা করেছিল স্বাভাবিক কণ্ঠে, এখন কি বাড়ী ফিরছেন?

বাড়ী? নিখিল সাধারণ আলাপের স্তরে নেমে আসতে পেরে যেন কৃতজ্ঞ হয়ে বলেছিল, না, এর মধ্যে বাড়ী যাব কি?

একটু হেসে নিজের স্বাভাবিকতা খুঁজে পেয়ে তার পর বলেছিল, আরও দু-চারটে দরজা থেকে হতাশ হয়ে না ফিরলে বিবেকেই যে বাধবে। রাত্রে ঘুম হবে না।

বিবেককে কতটা সমীহ করেন জানি না,—শোভনাও কৌতুকের স্বরে বলেছিল, নইলে বলতাম কোথাও গিয়ে খানিক বসি চলুন। একটা প্রতিজ্ঞা ত ভেঙেছেন আর একটা ঘাও না হয় বিবেককে দিলেন!

শুধু কথাগুলোই নয়, শোভনার এ গলার স্বর ও মুখের ভাবও নিখিলের কাছে অপ্রত্যাশিত। এ শোভনা যেন কোন এক আবরণ সরিয়ে অকস্মাৎ বেরিয়ে এসেছে।

তাই না হয় দিলাম! উত্তর দিতে নিখিলের একটু দেরী হয়েছিল, কিন্তু কাছাকাছি বসবার জায়গা···

একটু থেমে ভেবে নিয়ে নিখিল বলেছিল, স্টেশনের একটা রেস্তোরাঁয় যাওয়া যায় বটে, তবে সেখানে জায়গা পেলে হয়!

জায়গা তারা পেয়ে গেছে ভাগ্যক্রমে। এক কোণের একটা ছোট টেবিল। সবচেয়ে সুবিধে, দুটির বেশী চেয়ার সেখানে ধরে না।

ভীড়ের দরুন, না পোশাক-আশাকে খদ্দেরের দর কষে ফেলে, বলা যায় না, 'বয়'রা প্রথম গ্রাহ্যই করে নি। দু-চারবার তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টায় বিফল হয়ে অনেক কষ্টে একজনকে দু'কাপ চায়ের কথা বলতে পেরেছে শেষ পর্যন্ত।

আর কিছু খাবেন? জিজ্ঞেস করেছে নিখিল।

না, শুধু বসবার জন্যেই এসেছি, খাবার জন্যে নয়। তা ছাড়া··· বলে শোভনা একটু থেমেছে।

তা ছাড়া কি? নিখিল হেসেই উল্টো প্রশ্ন করেছে, বেকার মানুষের পকেটের অবস্থা বুঝে তাকে লজ্জা থেকে বাঁচাতে চাচ্ছেন?

তাই যদি করি, সেটা অপমান মনে করবেন কি?

শোভনার গলায় এবার বুঝি ঠিক কৌতুকের সুর নেই।

নিখিল কিন্তু এবারেও হেসে বলেছে, না, তা করব না, তবে বেকারকেও বেহিসেবী হবার সুযোগ একদিন না হয় দিলেন। তারও একটা উল্লাস আছে। ফুরোবার ভয় যাদের নেই ফতুর হবার উত্তেজনা তারা জানে না।

শোভনা উত্তর না দিয়ে নিখিলের মুখের দিকে খানিক চেয়ে থেকেছে। তার দৃষ্টিতে বিস্ময় আর কৌতুকের সঙ্গে একটা নতুন কৌতূহলও বুঝি মেশানো। নিখিল বক্সীকে এই কিছুদিনের মধ্যে সামান্য একটু জানবার সুযোগ তার হয়েছে। কিন্তু যা জেনেছে তাতে সত্যিকার পরিচয় কিছুই কি ধরা পড়েছে? পড়ুক বা না পড়ুক সে পরিচয় জানবার বিশেষ কোন আগ্রহ তার ছিল বলে মনে হয় না। আজ কিন্তু সামনের মানুষটাকে শুধু একটা সাময়িক ধারণার ছাপ দিয়ে জীবনের অনেক পরিচয়ের ভিড়ে ঠেলে রাখতে পারা যাচ্ছে না, একটা জিজ্ঞাসা মনে জাগছে যা অগ্রাহ্য করবার নয়।

শোভনার উত্তর না দিয়ে শুধু চেয়ে থাকার ধরনে একটু অবাক্ হয়ে নিখিল বলেছে আবার, কই, কিছু বললেন না?

শোভনা প্রথমে এবার হেসে উঠেছে। তার পর সহজ হয়ে বলেছে, আপনাকে ফতুর করবার মত কিছু খাবার কথা ভেবে পাচ্ছি না। সুতরাং শুধু ঐ চা-ই থাক্। কিন্তু সত্যি এখন কি মনে হচ্ছে জানেন, সে রকম সম্বল থাকলে খুব একটা বাড়াবাড়ি-গোছের কিছু করতে পারলে মন্দ হত না। নিত্যকার নিয়ম ভাঙা একটা উদ্দামতাও এক একদিন বোধ হয় দরকার। এই খাওয়ার ব্যাপারই ধরুন না, এই একটা সামান্য রেস্তোরাঁতেই বা বসে আছি কেন? একটা খুব জমকালো নামডাকওয়ালা জায়গা, পয়সার যেখানে খোলামকুচির মত

ছিনিমিনি হয় সেরকম একটা জায়গায় একদিন গিয়ে বেপরোয়া হতেই বা দোষ কি! গল্পে-উপন্যাসে সত্য-মিথ্যা পড়েছি, রাস্তায় যেতে যেতে দূর থেকে দেখে কল্পনা করেছি, কিন্তু সে রকম একটা জায়গায় কোনদিন যাবার ভাগ্য হয় নি। ভাগ্য হয় নি বলে যে মনে মনে ক্ষোভ হয়েছে কোনদিন তাও নয়, কিন্তু আজ যেন হচ্ছে। আজ আরও অনেক কিছুর জন্যে ক্ষোভ হচ্ছে, মনে হচ্ছে অনেক কিছুতেই ঠকেছি বড় বেশী, শুধু ঠকি নি, নিজেকেও ঠকিয়েছি···

বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেছে শোভনা।

বুকের চাপা অন্ধকার থেকে হঠাৎ ছিটকে আসা এ স্ফুলিঙ্গের সম্মান নিখিল রেখেছে নীরব সহানুভূতি দিয়ে।

একটু বাদেই আবার কৌতুকের রেখা ফুটে উঠেছে শোভনার মুখে। হেসে বলেছে, কোন নাটক থেকে মুখস্থ বললাম ভাবছেন ত? আচ্ছা, আপনি কখনও নাটক করেছেন, মানে স্টেজে নেমেছেন অভিনয় করতে?

প্রসঙ্গ বদলাবার এ চেষ্টায় নিখিল সাহায্যই করেছে, বলেছে, তা নেমেছি বইকি! এবং দস্তুরমত হাততালি পেয়েছি। এখন ত মনে হয় পেশা হিসাবে ওইটে বেছে নিলে আজ আপনাকে সেই সব নামজাদা হোটেলেই নিয়ে যেতে পারতাম।

তাই যদি হত তা হলে সঙ্গে নেবার লোকও হত আলাদা, আপনার রাজ্যের ত্রিসীমানায় আমি আর থাকতাম কোথায়?

নিখিলের ইচ্ছে হয়েছে শোভনার কথাটাই ঘুরিয়ে বলে। বলে, আমাকে নিয়তি মানি কিনা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমিও যদি সেই কথাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, যদি বলি যে রাজ্যেই থাকি দেখা আমাদের হতই!

কিন্তু নিখিল সে ইচ্ছে চেপেই রেখেছে। তার বদলে সুরটাকে হাল্কা রেখে শোভনার কথাতেই সায় দিয়ে বলেছে, তা ঠিকই

বলেছেন। সুতরাং কি হলে কি হত সে কল্পনা করে লাভ নেই, তবে অভিনয় আমি সত্যিই করেছি। আপনি কখনও করেছেন ?

হ্যাঁ করেছি, কলেজে পড়াবার সময়, তবে খুব খারাপ অভিনয়, স্টেজে নেমে পার্ট ভুলে গেছলাম, প্রম্পটার চেষ্টা করেও খেই ধরাতে পারে নি। হলের লোকেরা প্রম্পটারের গলাই শুনতে পেয়েছে, আমার নয়। সমস্ত প্লে আমার জন্যে মাটি হয়ে গেছল। তার পর আর কোনদিন ও ধার মাড়াই নি।

নিখিলের মুখে হাসি, শোভনার মুখে আত্মসমালোচনার কৌতুক। আবহাওয়াটা কি বেশ সহজ স্বাভাবিক হয়ে এসেছে ?

হলেও তেমন থাকে নি শেষ পর্যন্ত। ওপরে একটা আবছা কুয়াশার আবরণ পড়েছিল মাত্র। সেটা হঠাৎ যেন আপনা থেকেই সরে গেছে।

'বয়'দের একজন কৃপা করে দু পেয়ালা চা টেবিলের ওপর রেখে যাবার পরই হাওয়াটা গেছে বদলে।

শোভনা পেয়ালাটা তুলে চা মুখে দিতে যাচ্ছিল, নিখিল হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বলেছে, দাঁড়ান, খাবেন না। চায়ে কি যেন পড়েছে মনে হচ্ছে।

শোভনা পেয়ালাটা নামিয়েছে।

হ্যাঁ, সত্যিই কি একটা পড়েছে। প্রথমে চায়ের পাতাই মনে হয়েছিল, কিন্তু চায়ের পাতা নয়, একটা পোকা। বেশীক্ষণ আগে পড়ে নি। গরম চায়ের ভেতর পড়ে এখনও একটু ছট্‌ফট্ করছে।

মাছি ত নয় ? ওতে কিছু হবে না। বলে শোভনা পেয়ালাটা কাত করে ডিসের ওপর চায়ের সঙ্গে পোকাটা ফেলে দিয়ে আবার খাবে বলেই স্থির করেছে। কিন্তু তা আর সম্ভব হয় নি।

না না, ও কি করছেন ? বলে পেয়ালাটা টেনে নিয়ে নিখিল বলেছে, ওই পোকা-পড়া চা কি খায় নাকি ? আর এক পেয়ালা আনাচ্ছি দাঁড়ান।

আর এক পেয়ালা আনাবেন ? কতক্ষণে ? বলে শোভনা হেসেছে, তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলেছে, আবার আনালেই যে পোকা পড়বে না কি করে জানলেন ? না, চা খাওয়া আমার ভাগ্যে নেই। আপনি বসে খান, আমি উঠছি।

সে কি ! আহত বিস্ময়ে নিখিলের মুখ থেকে আপনা থেকেই কথাটা যেন বেরিয়ে গেছে।

শোভনা সত্যিই উঠে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু নিখিলের মুখের দিকে চেয়ে আর চলে যেতে পারে নি। তার দিকে তাকিয়ে একটু লজ্জিত বোধ করেই বলেছে, এখন চলে যাওয়াটা খুব অভদ্রতা হবে, না ? আচ্ছা, আমি বসছি। আপনি চা-টা খেয়ে নিন। কিন্তু আমার জন্যে আর চা আনাবেন না।

বেশ, তা আনাব না। নিখিল নিজের চায়ের পেয়ালাটাও সরিয়ে রেখে বেশ একটু দৃঢ় স্বরে বলেছে, কিন্তু আমার কটা প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আপনিও উঠতে পারবেন না।

এটা কি জুলুম না কি ? শোভনার স্বরে কৌতুক যেমন নেই তেমন বিরক্তিও নয়, আপনার প্রশ্নের জবাব আমি দিতে যাব কেন ? আমি এখুনি উঠে চলে গেলে আপনি কি বাধা দেবেন ?

না, তা দেব না। অধিকার থাকলেও দিতাম না। কিন্তু আপনিও এমনভাবে চলে গিয়ে শান্তি পাবেন কি ?

হ্যাঁ, আমার বিবেকে একটু লাগা উচিত। আপনাকে আমিই এক রকম এখানে টেনে এনেছি বটে। কি আপনার প্রশ্ন, বলুন শুনি।

বয় এসে টেবিলের পাশে দাঁড়াতে কথায় বাধা পড়েছে। নিখিল চায়ের পেয়ালা নিয়ে যেতে বলে আরও নতুন হু'পেয়ালার অর্ডার দিয়েছে। একটু অদ্ভুত ভাবে হুজনের দিকে চেয়ে পেয়ালা নিয়ে বয় চলে যাবার পর বলেছে, চা চেয়েছি, আপনাকে খাওয়াবার জন্যে নয়, এখানে বসবার ভাড়া হিসেবে।

আপনার প্রশ্নের উত্তর এক কথায় তা হলে দেওয়া যাবে না মনে হচ্ছে। হাল্কা ভাবে বলবার চেষ্টা সত্ত্বেও শোভনার গলায় একটু তিক্ততার যেন আভাস পাওয়া গেছে।

কিছুক্ষণ নিখিল কোন জবাব না দিয়ে মাথা নিচু করে কি যেন ভেবেছে। তার পর মুখ তুলে শোভনার চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বলেছে, আপনার সম্বন্ধে আমার মনের ভাব কি তা আপনি জানেন। প্রতিজ্ঞা যা করেছিলাম তা রাখতে পারতাম কি না জানি না, কিন্তু আজ এমন আশাতীত ভাবে দেখা না হয়ে গেলে এ সব প্রশ্ন, বিশ্বাস করুন মনের মধ্যে চেপেই রাখতাম। কিন্তু আজ ভাগ্যই যখন এমন ভাবে সুযোগ দিয়েছে তখন ক'টা কথা আমি না জিজ্ঞাসা করে পারব না। আমি আগে যা বলেছি সে কথাটা ধরবেন না। আপনাকে জোর করে কোন কথা আমি বলাতে চাই না। তা বলান যায়ও না। আমার যা জিজ্ঞাসা করবার আমি করব। আপনার ইচ্ছা হয় উত্তর দেবেন, নইলে দেবেন না। তবে আপনাকে দেখে আজ আমার মনে হচ্ছে, কারুর কাছে নিজের ভেতরের কথা কিছু বলতে পারলেও আপনি যেন স্বস্তি পাবেন। আমাকে সেই রকম একজন বন্ধুই মনে করুন না যাকে বিশ্বাস করে ঠকবার কোন ভয় কোনদিন নেই। পুরুষ বা নারী এ রকম কোন বন্ধু আপনার আছে বলে আমার মনে হচ্ছে না।

নিখিল চুপ করেছে, শোভনাও নীরব।

এ নীরবতা কি এক অস্পষ্ট আবেগে যেন স্পন্দমান।

দুজনেরই মনে হয়েছে তারা যেন হঠাৎ এই ব্যস্ত কোলাহলমুখর পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

ধীরে ধীরে শোভনার মুখের কঠিন রেখাগুলো কখন কোমল হয়ে এসেছে। সেই সঙ্গে ভেতরটাও বোধ হয়।

নিখিল তখনও কোন প্রশ্ন করে নি। শোভনা নিজে থেকেই বলতে সুরু করেছে, কি আপনার প্রশ্ন ঠিক জানি না। তবে আমার

জীবনের কথাই আপনি জানতে চান মনে হচ্ছে, কি করে এমন ভরাডুবিতে এসে পৌঁছলাম তাও বোধ হয় আপনার জিজ্ঞাস্য। কিন্তু কয়েকটা ঘটনা ছাড়া আর কিছুই ত আপনাকে বলতে পারব না। তা থেকে আপনি কি-ই বা বুঝবেন! আমি নিজেও বুঝতে পারি না কোথা থেকে, কেমন করে এই পরিণামে এসে পৌঁছলাম।

শোভনা একটু থেমেছে। তার পর আবার যখন বলতে সুরু করেছে তখন তার গলার স্বর যেন বুকের গভীরতা থেকে উঠে এসেছে মনে হয়েছে।

নিখিলের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে শোভনা বলে গেছে, যাকে ভালবেসে বিয়ে করা বলে আমি তাই করেছিলাম। এমন প্রচণ্ড স্রোত সেদিন আমায় টেনেছিল যে যত বড় বাধাই হোক আমি বোধ হয় অনায়াসে অগ্রাহ্য করতে পারতাম। বাধা অবশ্য তেমন কিছুই আসে নি। অভিভাবক বলতে ছিলেন শুধু আমার মা। তিনি মনে যদি কিছু ভেবে থাকেন, মুখে তা প্রকাশ করেন নি। আর আমার স্বামী, তিনি যেন শুধু আমার হাত ধরে টেনে নেবার অপেক্ষাতেই ছিলেন। সেদিন এত সহজে কেন তাঁকে জয় করতে পেরেছিলাম বুঝলে আজকের সর্বনাশের ইঙ্গিত বোধ হয় আমি পেতাম। কিংবা এ ধারণাও হয়ত আমার ভুল। ভাগ্য আমার ওপর নির্মম না হলে ওই মনের মেরুদণ্ডহীন মানুষটাকে নিয়েই জীবন আমি স্বচ্ছন্দে না হোক পরম সুখে কাটিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু তা হয় নি। আমাকে—আমাকে রাজরোগে ধরেছিল। তিন বছর আমি হাসপাতালে কাটিয়েছি আর তারই মধ্যে আমার স্বামী আবার যে বিয়ে করেছেন, এই সেদিন তা জানতে পেরেছি। নিজের চোখে আমার জায়গা যে দখল করেছে তাকে দেখেও এসেছি আজ। আর কি শুনতে চান, বলুন।

ধীরে ধীরে নিখিলের দিকে শোভনা মুখ ফিরিয়েছে এবার। গলা যত ভারীই হোক চোখ তার সজল নয়। কিন্তু সেই শুষ্ক চোখের

দৃষ্টিতে এমন কিছু আছে যা হতাশার চেয়ে গভীর, আবার ঘৃণার চেয়ে তীব্র।

শুনতে আরও অনেক কিছুই চাই। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নিজেকে যেন তৈরী করে নিয়ে বলেছে নিখিল, যদি অধিকার দেন ত পরে সে সব শুনব। কিন্তু আজ যা জানতে চাই তা এই যে কিছুক্ষণ আগে যাঁকে চিরকালের মত হারিয়ে যেতে দেবার কথা বলেছেন, তাঁকে মন থেকে মুছে ফেলতে পেরেছেন কি?

তা কি পারা যায়!

শোভনার গলাটা যেন একটু তীক্ষ্ণই শুনিয়েছে।

না, আমারই বলবার ভুল,—কুণ্ঠিত হয়েছে নিখিল, কথাটা আমি ঠিক সাজিয়ে বলতে পারি নি। মুছে ফেলা নিশ্চয়ই যায় না। আমি বলতে চেয়েছি এই—এই হারিয়ে যেতে দেওয়া মানে কি আপনার নিজেরও সবকিছু হারিয়ে ফেলা? মানে, যে প্রচণ্ড স্রোত একদিন আপনাকে টেনেছিল বলেছেন আজও তাই কি আপনাকে পেছন থেকে সামনে ফিরতে দিচ্ছে না?

অত ঘুরিয়ে বলবার চেষ্টা করছেন কেন? শোভনার গলায় এবার সহানুভূতির আভাসই পাওয়া গেছে।

শোভনা আরও কিছু বলবার আগেই কিন্তু নিখিল প্রতিবাদ না করে পারে নি।

ঘুরিয়ে বলবার চেষ্টা করছি না, কথাটাই সোজা করে বলবার নয়। আর সোজা করে বলতে গেলে যা বলতে চাই তা আরও বাঁকা হয়ে দাঁড়াবে।

শোভনা একটু চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বলেছে, হ্যাঁ, হেঁয়ালির মত শোনালেও কথাটা সত্যি। এমন অনেক কিছুই আছে যার সরল সহজ সার কথা ঠিক বলা যায় না। আপনি যা জানতে চান তা আমি একেবারে বুঝি নি এমন নয়। কিন্তু আপনার প্রশ্নটা যেমন স্পষ্ট হওয়া সম্ভব নয়, আমার উত্তরটাও তাই। যে প্রচণ্ড স্রোত একদিন আমায়

ভাসিয়ে নিয়ে গেছল তার বেগ আজ মনের মধ্যে কোথাও আছে বলে সত্যিই টের পাচ্ছি না, কিন্তু পিছনের একটা মিথ্যে বাঁধন ছিঁড়ে গিয়েও যেন কোথাও জড়িয়ে আছে। বাঁধন নয়, হয়ত সেটা তার দাগ মাত্র। তবু সেটা ভুলতেও পারছি না, মেনে নিতেও।

তার মানে মুখে যে সঙ্কল্পই করুন,—একটু বুঝি তিক্ত স্বরেই বলেছে নিখিল, মনে মনে সেই স্মৃতির বাঁধনেই বাঁধা থাকবেন!

শোভনা সোজা নিখিলের মুখের দিকে চোখ তুলে তাকিয়েছে এবার। তারপর দৃঢ় স্বরে বলেছে, না, তা থাকব না। জীবনে ঠকেছি যত তার চেয়ে নিজেকে ঠকিয়েছি অনেক বেশী, এই ক্ষোভ যে অসহ্য হয়ে উঠেছে তা ত বলেই ফেলেছি। ঠকতে হয়ত পরেও পারি, কিন্তু নিজেকে আর ঠকাব না।…

হঠাৎ যেন চমকে লজ্জিত হয়ে শোভনা চুপ করে গেছে।

পাশের টেবিলের দুটি ছেলে ও একটি মেয়ের মধ্যে একটা তুমুল তর্ক হচ্ছে। এমন সোৎসাহে ও উচ্চকণ্ঠে সে তর্ক চলছে যে না শুনে উপায় নেই। তর্কের বিষয় অতি সাধারণ। সিনেমার দুজন নায়িকার শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে বিচার। তর্ক যারা করছে তাদের ধারণা দেখে মনে হচ্ছে পৃথিবীর ভবিষ্যৎই বুঝি তাদের বিচারের ফলাফলের ওপর নির্ভর করছে।

শোভনা কিছুক্ষণ শুনে হেসে বলেছে, আমরা এখানে কি রকম বেমানান বুঝতে পারছেন। বেমানান শুধু নয়, এতক্ষণ ধরে যা বললাম সব যেন নিরর্থক বেসুরো। সত্যি কথা বলছি, এই চারিধারে যাদের দেখছি তাদের মত সহজ স্বাভাবিক হয়ে সিনেমার ছবি কি মাঠের খেলা নিয়ে মেতে থাকতে পারলে আমি ধন্য হয়ে যেতাম।

চারিধারে যাদের দেখছেন তারাও হয়ত যাকে সহজ স্বাভাবিক মনে করেন, সবাই তা নয়। তাদেরও মনে কত জট, জীবনে কত কি সমস্যা হয়ত আছে।

তা থাক্,—নিখিলের মৃদু প্রতিবাদে একটু অধৈর্যের সঙ্গেই শোভনা

বলেছে, কিন্তু জীবনের মানে আর হৃদয়ের সত্য বোঝবার নিষ্ফল চেষ্টায় তারা নিজেদের নাকাল করে না। যা ধরা ছোঁয়া যায় তাই নিয়েই তাদের কারবার।

হঠাৎ এ প্রতিক্রিয়ার কারণটা বুঝে নিখিল একটু হেসেছে।

শোভনার পরের অপ্রত্যাশিত অসংলগ্ন জিজ্ঞাসাটা কিন্তু তাকে চমকে দিয়েছে।

সে চাকরিটা সত্যিই চেষ্টা করলে পেতে পারি মনে করেন ?

তা জানি না। তবে চেষ্টা করলে আশা আছে বলেই মনে হয়েছিল। নিখিলের উত্তর দিতে একটু দেরী হয়েছে, কিন্তু হঠাৎ সে চাকরির কথা মনে হল কেন ?

কেন বুঝতে পারছেন না ? যা ধরা ছোঁয়া যায় তাই নিয়ে থাকতে হলে ওরকম একটা চাকরি সবার আগে দরকার। এখন কিন্তু উঠুন। এখানে বসবার ভাড়া যথেষ্ট উসুল হয়ে গেছে।

শোভনা উঠে দাঁড়িয়েছে। 'বয়'কে ডেকে চায়ের দাম চুকিয়ে আসবার সময় নিখিলের মনে হয়েছে, আশুবাবুর ভাড়াটে বাড়ীতে যার সঙ্গে প্রথম পরিচয় ও আজ যাকে নিয়ে এ রেস্তোরাঁয় ঢুকেছিল তার জায়গায় সত্যিই আর একটি মেয়ে যেন তার সঙ্গে চলেছে।

ষোল

শোভনা সত্যিই আরেকজন হতে চেয়েছিল। চেয়েছিল অতীতকে মুছে ফেলে দিয়ে নয়, তাই থেকেই নতুন সত্তায় উত্তীর্ণ হবার বেগ সংগ্রহ করে।

তার এই সঙ্কল্পে সাহায্য করবার জন্যেই পর পর কয়েকটি ঘটনা যেন ঘটে গেল।

প্রথম ঘটনা তার চাকরি পাওয়া।

সত্যিই শোভনা অপ্রত্যাশিত ভাবে কাজ পেয়ে গেল একটা।

নিখিল বক্সী যে কাজের সন্ধান এনেছিল সেটা নয়। তবে সে চাকরির আশায় না গেলে এ কাজের হদিশ মিলত না, আর দেখা হত না জেনী-দির সঙ্গে।

জেনী-দির সঙ্গে দেখা হওয়াটাই সবচেয়ে বড় ঘটনা।

নিখিলের সন্ধান দেওয়া চাকরির জন্যে দরখাস্ত করার কিছুদিন পরেই ইনটারভিউ-এর ডাক পেয়ে শোভনা একটু উৎসাহিতই হয়েছিল, কিন্তু ইনটারভিউ দিতে গিয়ে অন্য প্রার্থীনীদের চেহারা, পোশাক, চাল-চলন দেখে তার মন দমে গিয়েছিল সেইখানেই। সাজপোশাক তার কিছু লজ্জা পাবার মত ছিল না অবশ্য। আশুবাবুর বদান্যতার সুযোগ এই একটিবার সে নিতে আপত্তি করে নি। পছন্দসই শাড়ী ব্লাউজ নিজে দেখেশুনে কিনে এনেছিল, প্রসাধনেরও ত্রুটি করে নি। কিন্তু মস্তবড় কোম্পানীর হাল-ফ্যাশানের অফিস-বাড়ীর যে ঘরটিতে তাদের জনে জনে ডাক পড়বার অপেক্ষায় বসতে বলা হয়েছিল, সেখানে পা দিয়েই বুঝেছিল চেহারা চটক পোশাক যদি চাকরি পাবার কারণ হয় তাহলে কোন আশাই তার নেই। ঘরের একটি কোণে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে সে গিয়ে বসেছিল। একেবারে আধুনিক কায়দায় সাজানো ঘরের যান্ত্রিক পরিচ্ছন্নতার মধ্যেই যেন একটা উন্নাসিক অবজ্ঞা প্রচ্ছন্ন বলে তার মনে হয়েছিল।

অন্যান্য মেয়েরা নিজেদের মধ্যে আলাপ-সালাপ করছে—বাংলার চেয়ে ইংরাজি শব্দের প্রাধান্যই তাদের আলাপে বেশী। ইনটারভিউ দিতে আসা যেন তাদের কাছে একটা হাসি-তামাসার ব্যাপার। হয়ত আসলে তারাও শোভনার মতই মনে মনে শঙ্কিত, শুধু বাইরের বেপরোয়া তাচ্ছিল্যের ভাবটা তার আবরণ মাত্র। কিন্তু এই আবরণটুকু দেবার ক্ষমতাও তার নেই।

সবচেয়ে খারাপ লেগেছিল একজনকে, মেয়ে না বলে তাঁকে মহিলাই বলা উচিত। সাজপোশাকে একেবারে আধুনিকা। উগ্রতা না থাকলেও স্নিগ্ধতাও কোথাও নেই। বয়সটা মাজা-ঘষা দেহের

আঁটসাট রোগাটে গড়নে বোঝা না গেলেও তু'কানের ওপর চুলের রূপোলী ঝিলিকে আর চোখের কোলের কুঞ্চনে ধরা পড়ে।

চাকরির সন্ধানে যারা এসেছে তাদের কয়েকজনের তিনি পরিচিত বোঝা যায়। জেনী-দি নামটা তাদের মুখেই প্রথম শুনেছিল। নামটা শুনে একটু বিস্মিত যেমন হয়েছিল তেমনি অকারণে একটা বিদ্বেষও অনুভব করেছিল মনের মধ্যে। বিদ্বেষটা বোধ হয় জেনী-দির কোন কিছুই যেন গ্রাহ্য-না-করা একটা হাল্কা প্রগল্‌ভতায়। সবটাই শোভনার কৃত্রিম মনে হয়েছিল। কথাবার্তার মধ্যে একটা বেহায়াপনার আভাসও তাকে পীড়িত করেছে। যেমন একটি মেয়ে ক্ষোভের ভান করে বলেছে, আপনি এখানে এলে আমরা কোথায় যাই বলুন ত জেনী-দি? কোথায় বাঘ ভালুক শিকার করবেন, না আমাদের সঙ্গে ইঁতুর বেড়াল মারতে এসেছেন? জেনী-দি হতাশার ভঙ্গী করে বলেছে, হায় রে, ইঁতুর বেড়ালও যে আর এই ভোঁতা তীরে বেঁধে না। নেহাৎ স্বভাবদোষে আসি।

কিছুক্ষণ অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে বসে থেকে হঠাৎ সে উঠে পড়েছিল। এখানে সাক্ষাৎকারের অপেক্ষায় বসে থেকে কোন লাভ নেই তখন সে বুঝে নিয়েছে, তার চেয়ে নিজের মান বাঁচিয়ে চলে যাওয়াই ভালো।

ঘরের দরজা দিয়ে বার হবার লম্বা করিডর। সে করিডরের তু'প্রান্তে নিচে নামবার লিফ্‌ট ও সিঁড়ি।

কোন দিকের সিঁড়িটা কাছে হয় ঠিক করে নিয়ে কয়েক পা যেতে না যেতেই পেছন থেকে কে বলে উঠেছিল, সে কি! আপনি যাচ্ছেন কোথায়?

ইনটারভিউ দিতে এসে নিজের খুশিতে চলে যাওয়া আইনের চোখে অপরাধ নিশ্চয় নয়, তবু শোভনার মনে হয়েছিল দারুণ একটা অন্যায় করতে গিয়ে সে যেন ধরা পড়ে গেছে।

চমকে বিবর্ণ মুখে ফিরে তাকাবার পর তার কিন্তু বিস্ময়ের সীমা ছিল না।

ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে জেনী-দিই তাকে ডাকছেন।

শোভনার কিছু বলবার মত অবস্থা তখন নয়।

জেনী-দিই তার কাছে এগিয়ে এসে ঈষৎ হেসে বলেছিলেন, পালিয়ে যাচ্ছিলেন বুঝি ?

কথাটা নয় জেনী-দির মুখের হাসিটাই শোভনাকে অবাক্ করে ছিল বেশী। ওই পালিশ করা রং লাগানো মুখে এমন স্নেহ ও সহানুভূতির হাসি ফুটতে পারে শোভনা ভাবতে পারে নি।

শোভনা তখনও কিন্তু বলবার মত কিছু খুঁজে পায় নি।

জেনী-দি অসঙ্কোচে তার পিঠে হাত দিয়ে হেসে বলেছিলেন, প্রথম প্রথম ওই রকম পালাবার ইচ্ছেই হয়। তা ছাড়া আমাদের ধরন-ধারণ দেখেও ভড়কে গিয়েছিলেন নিশ্চয়।

না,—বলে শোভনা একটু মৃদু প্রতিবাদ করতে গেছল। জেনী-দি তাকে থামিয়ে বলেছিলেন, লুকিয়ে লাভ কি ভাই। নিজেদের কি আমরা চিনি না। তবে এক হিসেবে পালিয়ে এসে ভালই করেছেন। আপনার কি আমার ওখানে কোন আশাই নেই।

জেনী-দির সঙ্গে নিজের কোন স্বাধীন ইচ্ছা ছাড়াই শোভনা তখন কাছের সিঁড়িটার দিকে চলতে সুরু করেছে। এতক্ষণে নিজেকে সে কিন্তু অনেকটা সামলে নিতে পেরেছে। তাই স্পষ্ট করেই জিজ্ঞাসা করতে পেরেছিল, আপনার কোন আশা নেই কেন বলছেন ?

জানি বলেই বলছি। জেনী-দি সিঁড়ি দিয়ে না নেমে লিফ্টের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে বোতাম টিপেছিলেন।

লিফ্ট উঠে আসবার পর লিফ্টম্যান দরজা খুলে দিতে শোভনার সঙ্গে ভেতরে ঢুকে আগের কথার জের টেনে বলেছিলেন, তবু কেন মরতে এসেছিলাম মনে ভাবছেন নিশ্চয়। ওটা অভ্যাস কিংবা নেশাও বলতে পারেন। নইলে আগে থাকতেই জানি এই বিজ্ঞাপন দিয়ে

ইনটারভিউ-এ ডাকাটা একটা চোখে ধুলো ছাড়া কিছু নয়। কে কাজ পাবে আগেই ঠিক হয়ে আছে, শুধু বাইরের ঠাট্ বজায় রাখবার জন্যে এই সব ব্যবস্থা।

লিফ্‌ট নিচে নামবার পর তা থেকে বেরিয়ে অফিস-বাড়ির দরজার কাছে এসে জেনী-দি হেসে বিদায় নিয়ে বলেছেন, চলি ভাই। আবার হয়ত কোথাও ইনটারভিউ-এ দেখা হতে পারে।

জেনী-দি চলে যাবার পর তাঁকে এগিয়ে যাবার একটু সময় দেবার জন্যই শোভনা সেখানে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। সামান্য কয়েক মিনিটের আলাপে একটা মানুষের কতটুকুই বা জানা যায়। তবু প্রথম দর্শনের পর যে ধারণা তার হয়েছিল জেনী-দির ক্ষণিকের পরিচয় যে তা ভেঙে দিয়েছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। আশা নেই জেনেও জেনী-দির মত মানুষের এই কাজের চেষ্টায় আসা ও ইনটারভিউ না দিয়েই চলে যাওয়ার রহস্য সম্বন্ধে কৌতূহল অবশ্য মেটবার নয় বলেই মনে হয়েছিল।

সে কৌতূহল মেটবার সুযোগ অমন ভাবে মিলবে শোভনা ভাবে নি।

অফিস থেকে বেরিয়ে ফুটপাথে নামতে না নামতেই দেখা গেছল জেনী-দি তার দিকেই ফিরে আসছেন।

যেতে গিয়ে ফিরে এলাম ভাই। জেনী-দি কাছে এসে হেসে বলেছিলেন, আপনি কোথায় যাবেন জিজ্ঞেস করতেই ভুলে গেছি। আসুন না আমি পেঁ ৗছে দিই। যেতে যেতে আর একটু আলাপ করাও যাবে।

পেঁ ৗছে দেবার কথায় একটু বিব্রত বোধ করে শোভনা মৃদু প্রতিবাদ করেছিল, না না, আপনি পেঁ ৗছে দেবেন কি! আমি—আমি অনেক দূর থাকি!

আহা! দূরে মানে ত হিল্লী-দিল্লী নয়। আমার সঙ্গে যেতে আপত্তি না থাকে ত চলুন।

না না, আপত্তি কিসের ! লজ্জিতভাবে বলতে হয়েছে শোভনাকে, কিন্তু আপনাকে অকারণে এত কষ্ট দিতে...

কষ্ট আমি সাধ করে যখন নিচ্ছি তখন আর কথা নয়। বলে জেনী-দি শোভনাকে আর কিছু বলতে দেন নি।

শোভনাকে বিনা প্রতিবাদেই জেনী-দির সঙ্গে যেতে হয়েছে কিন্তু কিছুদূর গিয়ে ফুটপাথের ধারে একটি গাড়ির দরজা যখন তিনি খুলে ধরেছেন তখন বিস্ময়বিহ্বল হয়েই প্রথমটা গাড়িতে চড়তে তার পা ওঠে নি।

গাড়ি অবশ্য এমন কিছু নয়। পুরনো মডেলের একটা 'টুরার'। জেনী-দি নিজেই তার চালিকা।

কিন্তু এরকম একটা গাড়িও যাঁর চালাবার সংস্থান আছে, সেরকম একজন জেনী-দির দরের মহিলা কেন যে সামান্য একটা চাকরির সন্ধানে ধরনা দিতে আসেন, আবার ফলাফলের জন্যে অপেক্ষা না করেই নিজে থেকে কেনই বা চলে যান এ রহস্যের কিছু হদিস সেদিন জেনী-দির পাশে বসে যেতে যেতেই শোভনা পেয়েছিল।

জেনী-দির সঙ্গে সেদিনের সেই দৈবাৎ পরিচয়ই তার পর কয়েক দিনের মধ্যে অত্যন্ত গাঢ় অন্তরঙ্গতায় কি করে যে পৌঁছেছে তা শোভনা নিজেই বলতে পারবে না।

শিক্ষা, দীক্ষা, অবস্থা ও সামাজিক পরিবেশের গভীর ব্যবধান সত্ত্বেও কোন এক গভীর আত্মীয়তার ভিত্তি যেন তাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল।

শোভনার নতুন মোড়-ফেরা জীবনে জেনী-দির আবির্ভাবও যেন ভাগ্যের একটা গূঢ় সঙ্কেত বহন করে এনেছে।

জেনী-দির দরুনই শোভনার নতুন চাকরি।

জেনী-দি সেদিন শোভনাকে সত্যি তার বাসায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। কিন্তু তার আগে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর নিজের ডেরায়।

ডেরা এমন কিছু নয়, তবে শোভনার কাছে তা একেবারে নতুন। আগেকার খাস ইংরেজদের পাড়া এখন পাঁচমিশেলী হয়েছে। কিন্তু শহরের সাধারণ ধনী-দরিদ্রের বাঙালী অঞ্চলের সঙ্গে তার কোন মিল নেই। প্যাণ্ট-কোট এখন সর্বত্র দেখা যায়। কিন্তু এখানে শাড়ীর চেয়ে স্কার্ট-ই বুঝি বেশী। কটা চুল নীল চোখও চোখে পড়ে। এই পাড়ারই একটি বিরাট্ ম্যানসনের ছোট একটি একানে ফ্ল্যাট নিয়ে থাকেন জেনী-দি। ছোট-বড় অমন পঞ্চাশটা ফ্ল্যাট নিয়ে ছ'তলা প্রমাণ বাড়ী। গেট দিয়ে ঢুকতে হয়, অপরিসর হোক্, লিফ্‌ট একটা আছে ওঠা-নামার। নিচের সিমেণ্ট বাঁধানো চত্বরে জেনী-দির মত আট-দশটা সরেস-নিরেস নতুন-পুরনো গাড়িও দাঁড়িয়ে থাকে।

জেনী-দি গাড়িটা রেখে শোভনাকে লিফ্‌টে তুলে তাঁর চারতলার ফ্ল্যাটে নিয়ে গেছলেন। এ বাড়ীর হিসেবে দু'কামরার নেহাৎ সস্তা এক ফ্ল্যাট। সাজসজ্জা আসবাবপত্রও সাদাসিধে মামুলী। কিন্তু শোভনার কাছে সবই অদ্ভুত লেগেছে। এই একটা জগতের সঙ্গে কোন পরিচয় তার ছিল না কোনদিন।

কয়েক মিনিটের পরিচয়ে জেনী-দি তাকে হঠাৎ নিজের ফ্ল্যাটে এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে এনে তুললেন কেন?

এ প্রশ্নের জবাব একদিনে পায় নি। পেয়েছে ধীরে ধীরে জেনী-দির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার পর। ঘনিষ্ঠতা তাদের সেই দিন থেকেই সুরু হলেও জেনী-দি এক নিঃশ্বাসে তাঁর কাহিনী কোনদিন বলে যান নি। এখানে-ওখানে আলাপ-আলোচনার টুকরো থেকে শোভনাকেই তা গেঁথে তুলতে হয়েছে নিজের মনে।

ভালবাসার মত ভাল লাগারও কোন স্পষ্ট বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বোধ হয় দেওয়া যায় না। কেন এক মুহূর্তে কাউকে আপনার বলে মনে হয় তার কোন নিয়ম-কানুন নেই। শোভনাকে জেনী-দির হয়ত সেই রকম ভালই লেগেছিল, লেগেছিল হয়ত মিলের চেয়ে অনেক কিছুতে গরমিলের জন্যেই। কিন্তু হঠাৎ শোভনাকে নিজের ফ্ল্যাটে

শুধু নয়, আসলে নিজের জীবনেই ডেকে আনার কারণ বোধ হয় নিঃসঙ্গতা, যে নিঃসঙ্গতা একটা বয়স পার হবার পর জেনী-দির মত মেয়েকেও কাতর করে তোলে।

এককালে যাকে ইঙ্গবঙ্গ সমাজ বলা হত জেনী-দি তার মধ্যেই মানুষ। কন্‌ভেণ্টে পড়াশুনা করেছেন, সাহেবিয়ানার পরিবেশে বড় হয়েছেন। বিয়ে নিজেদের সমাজেই হয়েছিল আলাপ পরিচয় পূর্বরাগ ইত্যাদি সব ধাপ পেরিয়ে। কিন্তু তবু সে বিয়ে সুখের হয় নি। সুখের না হলেও হয়ত মানিয়ে চলা যেত, কিন্তু স্বস্তিটুকুও জেনী-দি পান নি। জুলুম অত্যাচার ঠিক নয়, মন মেজাজ স্বভাব প্রবৃত্তি রুচির গরমিল। সে গরমিল দিন দিন স্পষ্ট হয়ে প্রাত্যহিক জীবন তিক্ত করে তুলেছে। এ তিক্ততা পাছে আরো তীব্র কিছুতে পৌঁছয়, পরস্পরের সম্মতিক্রমেই তাই ছাড়াছাড়ি হয়েছে। বিবাহ-বিচ্ছেদের কিছুদিন বাদে স্বামী বিদেশে চলে গেছেন, আর ফেরেন নি। জেনী-দি বাপ-মায়ের একমাত্র মেয়ে। দুজনেই তাঁরা গত হয়েছেন। মেয়ের জন্যে যা রেখে গেছলেন তা আগেকার দিনের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। দিনকাল বদলাবার দরুন তার মূল্য কমে গেছে। তখন যা নিশ্চিন্ত সাচ্ছল্য দিতে পারত, এখন তাতে একরকম চলে যায়। জেনী-দির আর্থিক ভাবনা খুব বেশী তাই নেই। আগে পছন্দমত ছোটখাট কাজকর্ম করেছেন। ভালো না লাগলে ছেড়ে দিয়েছেন। এখনও জীবিকার জন্যে চাকরি খোঁজবার ঠিক দরকার নেই। তবু একটু-আধটু ঘোরাফেরা না করে পারেন না, যে নিঃসঙ্গতা ক্রমশঃ চারদিক দিয়ে ঘিরে আসছে বলে ভয় হয় তাই এড়াতে বোধ হয়। কাজকর্ম এখনও একেবারে পান না তা নয়, কিন্তু বেশীর ভাগই মনের মত হয় না। নিজের সমাজের সঙ্গেও যোগাযোগ বিশেষ নেই। তা ছাড়া সময়ের সঙ্গে তাঁদের সে সমাজেও ভাঙ্গন ধরেছে। পুরনো-কালের মানুষ শুধু নয় রুচি প্রকৃতি আদর্শও সর্বক্ষেত্রে বাতিল না হলেও ম্লান হয়ে গেছে। এখনও পুরনো কালের চেনাশোনা মহলে

উৎসবে পার্টিতে ডাক পড়ে কিন্তু সে সব উৎসব থেকে আরো হতাশ হয়ে ফিরতে হয়। সেখানকার কৃত্রিম উৎসাহ উত্তেজনা যেন আরো করুণ। সে সমাজ নিজের অন্তিম নিয়তি যেন বুঝেও না বুঝবার ভান করেছে।

নিঃসঙ্গতার এই স্তরে পৌঁছে জেনী-দি দৈবাৎ শোভনাকে পেয়ে বেঁচে গেছেন। তাঁর যে জগৎ ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হয়ে এসে কঠিন কারাগার হয়ে উঠেছিল শোভনাই যেন তার নতুন দরজা খুলে দিয়েছে। শোভনার জন্যে তাই তাঁর উৎসাহের সীমা নেই। পরিচয়ের কিছুদিন বাদেই তিনি শোভনার একটা কাজের ব্যবস্থা সত্যিই করে ফেলেছেন। কাজটা সত্যি ভালো। শোভনার কাছে অন্ততঃ আশাতীত।

নামজাদা এক বড় কোম্পানী শহরের সৌখিন পাড়ায় একটা শো-রুম খুলেছে। বেচাকেনার দোকান ঠিক নয়, নিজেদের তৈরী জিনিসপত্র সাধারণের কাছে প্রচার করাই আসল উদ্দেশ্য। আধুনিক সৌখিন ধনী সমাজের গৃহসজ্জার উপকরণ আসবাবপত্রই সেখানে প্রধান।

জেনী-দি নিজে সেখানে কাজ সংগ্রহ করে শোভনাকেও সহকারিণী হিসেবে নেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন।

শোভনা এ কাজ নিতে একটু দ্বিধাই করছিল প্রথম। এখানে যে ধরনের লোকের আনাগোনা তাদের জগতের সঙ্গে কোন পরিচয়ই তার নেই। তাদের সঙ্গে দুটো কথাবার্তা কইতে গেলেই সে ধরা পাড়ে যাবে না কি?

কিন্তু জেনী-দি তার সব আপত্তি হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, ধরা পড়বে কার কাছে! সে যদি কানা হয়, অন্যেরা. চোখে দেখে না। সত্যিকার রুচির বনেদ নতুন কালের ধাক্কায় ধ্বসে গেছে। এখন শুধু চোখ-কান বুজে ফ্যাশানের হুজুগে ভাসা।

শোভনার সাজসজ্জা প্রসাধন শুধু তিনি বদলে দিয়েছেন। এখন

তাকে দেখে চেনা ভার। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত ভোল পাল্টে গেছে। শোভনার অস্বস্তি হয়েছিল প্রথমে যথেষ্টই। কিন্তু জেনী-দি বুঝিয়ে দিয়েছেন, যে কাজ সে করতে যাচ্ছে তাতে বাইরের চটক আর পালিশটাই আসল।

জেনী-দির ধারণা যে ভুল নয় তার প্রমাণ শোভনা প্রথম থেকেই পেয়েছে। অপ্রস্তুত তাকে ত কোথাও হতেই হয় নি, তার বদলে অসুবিধে যা একটু-আধটু হয়েছে তা কোন কোন পুরুষ আগন্তুকের অতিরিক্ত আলাপের উৎসাহে। কিন্তু সেটাও গা-সওয়া হয়ে গেছে কিছুদিনে।

অসুবিধা সবচেয়ে যেটা বেশী হয়েছে তা হল এখনকার এই উগ্র আধুনিক সাজে আশুবাবুর বাড়ীর সেই আধা-পল্লী অঞ্চল থেকে প্রতিদিন কাজের জায়গায় আসা। বড় রাস্তায় এসে পৌঁছতে পারলে আর অবশ্য কোন ভাবনা নেই। কিন্তু তার আগের দীর্ঘ পথ এই সাজ-পোশাকে প্রতিদিন হেঁটে আসা একটা বিড়ম্বনা। মুখের আলাপ না থাক, এ রাস্তার অনেকেই তাকে সেই প্রথম এ পাড়ায় আসার পর থেকেই দেখে আসছে। তাদের সে বিস্মিত বিদ্রূপ-দৃষ্টি প্রতিদিন তাকে যেন জর্জর করে দেয়। চেষ্টা করেও এই ব্যাপারে নিজেকে নির্বিকার করে তুলতে সে পারে না।

একমাত্র সৌভাগ্যের কথা এই যে, আশুবাবুর সামনে দিয়ে এ সাজ-পোশাকে শোভনাকে বার হতে হয় নি। শোভনার এ চাকরি পাবার কিছু দিন আগেই আশুবাবু সত্যিই তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়ে গেছেন। যাবার আগে শোভনাকেই তাঁর বাড়ীঘর দেখাশোনার ভার দিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শোভনা রীতিমত অনুনয় বিনয় করে তাঁকে নিরস্ত করেছে কোন রকমে। শেষ পর্যন্ত আশুবাবুর সেই দাবা খেলার বন্ধু উমেশবাবুকেই এ দায়িত্ব দিয়েছেন। শোভনা শুধু তার ঘরটিতে বিনা ভাড়ায় যত দিন ইচ্ছা থাকবার অধিকারটুকু পরম অনুগ্রহ হিসেবে গ্রহণ করেছে।

কিন্তু অনুগ্রহের দানের মর্যাদাও তার পক্ষে রাখা ক্রমশঃ অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

জেনী-দিকে এ সমস্ত কথা কিছুই শোভনা অবশ্য জানায় নি। কিন্তু নিজে থেকেই, কি বুঝে বলা যায় না, তিনি হঠাৎ একদিন শোভনাকে তাঁর ফ্ল্যাটে এসে থাকতে বলেছেন।

শোভনার আশু সমস্ত সমস্যার এমন সমাধান আর কিছু বুঝি হতে পারে না, তবু জেনী-দির স্নেহ-প্রীতির এ নিদর্শনে অভিভূত হয়েও সে এক কথায় সায় দিতে পারে নি। সময় নিয়েছে কটা দিন ভেবে দেখবার।

ভেবে দেবখার সময় নেবার কারণ তার সাময়িক সুবিধা অসুবিধার সমস্যার চেয়ে আলাদা কিছু। শুধু আলাদা কিছু নয় তার চেয়ে অনেক গুরুতর কিছু, যা এতদিন বাদে সত্যই তার জীবনের একেবারে নতুন পাতা ওল্টাবার দাবী নিয়ে এসেছে।

জীবনের সমস্ত ভিত নতুন করে পাতবারও সিদ্ধান্ত-সঙ্কট দেখা দিয়েছে অবশ্য মাত্র কয়েকদিন আগে কিন্তু তার সূচনা হয়েছে তার নতুন কাজ পাওয়ার কিছু দিন পরেই। কিংবা বুঝি অনুপমের নির্মম বঞ্চনার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাবার পর থেকেই সমস্ত ঘটনার বেগ এই জীবনের ধারা বদলানো প্রপাতের দিকেই অলক্ষ্যে বইছিল।

স্পষ্ট সূচনা অবশ্য শোভনাদের কোম্পানীর শো-রুমে অপ্রত্যাশিত-ভাবে সেই দুঃখী বৌ আর তার স্বামীর একদিন আসায়।

সেদিন শো-রুমে ভিড় বুঝি একটু বেশী। শোভনা অবাঙালী একটি পরিবারকে অতি আধুনিক আসবাবপত্রের মহিমা বোঝাতে তখন হিমসিম খাচ্ছে। দুঃখী বৌ বা তার স্বামীকে সে লক্ষ্য করে নি।

দুঃখী বৌ-ই তাকে প্রথম দেখে সবিস্ময়ে কাছে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করেছে, আপনি! আপনি শোভনা না?

প্রশ্নের এ সবিস্ময় সুরের কারণ বুঝতে শোভনার দেরি হয় নি।

শোভনাকে এখানে দেখা যতটা অপ্রত্যাশিত তার চেহারা পোশাকের এ পরিবর্তন তার চেয়ে বেশী নিশ্চয়।

ভেতরে কুণ্ঠিত বোধ করলেও শোভনা বাইরে তা প্রকাশ করে নি। বরং সহজ ভাবেই পরিহাসের সুরে বলেছে, হ্যাঁ শোভনাই। অনেক কিছু হয়ত বদলেছে কিন্তু নামটা বদলাতে পারি নি।

দুঃখী বৌ এবার সরল ভাবে স্বীকার করেছে, সত্যি ভাই, প্রথমটা সন্দেহই হচ্ছিল তুমি কি না। তা ছাড়া তোমাকে এখানে দেখবার কথা ভাবতেই পারি নি। অনুপমবাবুর কথা শুনে ত···

দুঃখী বৌ কথাটা আর শেষ করতে পারে নি। হঠাৎ দ্বিধাভরে থেমে যে ভাবে শোভনার দিকে তাকিয়েছে তাতেই শোভনার সমস্ত মুখ একটা অস্পষ্ট সন্দেহে কঠিন হয়ে উঠেছে। তবু যথাসাধ্য নিজেকে সামলাবার চেষ্টায় ঈষৎ হেসে সে বলেছে, একটু দাঁড়াও ভাই। আমার এই মক্কেলদের জেনী-দির হাতে সঁপে দিয়ে আসছি।

জেনী-দির খোঁজে যাবার কিন্তু দরকার হয় নি। তিনি বোধ হয় কিছু আগেই কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। দুঃখী বৌ আর তার স্বামীর সঙ্গে নমস্কার বিনিময়ের ধরনে বোঝা গেছে তাঁরা পরস্পরের অপরিচিতও নন।

জেনী-দির হাতে মক্কেলদের ছেড়ে দেবার পর শোভনা কিন্তু সোজাসুজিই প্রশ্ন করেছে, কি শুনেছ আমার সম্বন্ধে বল ত? আমি হঠাৎ মারা গেছি, না তাঁকে ছেড়ে কোথাও উধাও হয়ে গেছি?

মুখে হাসির আভাস রাখবার চেষ্টা থাকলেও শোভনার কণ্ঠের তীক্ষ্ণতা তাতে চাপা পড়ে নি।

দুঃখী বৌ বেশ একটু বিব্রত ভাবে একবার স্বামীর দিকে অসহায় ভাবে চেয়ে কথাটা ঘোরাবার চেষ্টা করেছে প্রথমে, না, মানে, সেরকম কিছু না, তবে—

শোভনা দুঃখী বৌকে নিজেই এবার এ বিব্রত অবস্থা থেকে

নিষ্কৃতি দিয়ে বলেছে, থাক, তিনি কি বলেছেন তা আমার না জানলেও চলবে। কিন্তু তাঁর সঙ্গে তোমাদের যোগাযোগ কোথায় হল সেইটেই বুঝতে পারছি না।

বাঃ, অনুপমবাবু এখন ওঁর কাছেই কাজ করছেন যে! তুমি— মানে, তুমি জান না?

দুঃখী বৌ অস্বস্তিকর প্রসঙ্গটা এড়াবার সুযোগ পেয়েও এই শেষ প্রশ্নে আবার এমন ভাবে জড়িয়ে পড়বে বোধ হয় ভাবে নি।

শোভনার কিন্তু এ ভুলের সুযোগ নিতেও যেন এবার ঘৃণা হয়েছে। একটু তিক্ত হাসির সঙ্গে বলেছে, না জানলেই বা ক্ষতি কি! তিনি কাজ পেয়েছেন এই ত যথেষ্ট। কোথায়, কি করছেন তা আমায় জানতেই বা হবে কেন?

এ আলোচনায় এখানেই ছেদ টানবার জন্য শোভনা তার পর বলেছে, এখন একটু চাকরির দায় সারতে হয়। আমাদের কোম্পানীর কেরামতি একটু ঘুরে দেখাই এস।

দুঃখী বৌ আপত্তি করে নি। কিন্তু সামান্য একটু দেখাশোনার পরই বলেছে, আজ আর থাক্ ভাই। এমনি আজ হঠাৎ খেয়ালে ঢুকে পড়েছিলাম। আরেকদিন বরং এসে ভাল করে দেখে যাব।

বেশ, তাই এস। কোম্পানীর স্বার্থে যেটুকু প্রয়োজন সেই মাপা ভদ্রতার হাসিটুকুই শোভনার মুখে দেখা গিয়েছে।

এতক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে ফিরলেও দুঃখী বৌ-এর স্বামী তার ছায়ার মতই নীরব ছিলেন।

বিদায় নিয়ে চলে যাবার পথে শো-রুমের দরজার কাছে থেমে পড়ে তিনি কি যেন তাঁর স্ত্রীকে বলছেন, শোভনা দেখতে পেয়েছে।

দুঃখী বৌ তার পরই আবার ফিরে এসেছে শোভনার কাছে।

অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভাবে বলেছে, একটা কথা বলবার জন্যে আবার ফিরে এলাম ভাই। উনিই বললেন সত্যি কথাটা তোমায় না জানিয়ে যাওয়া অন্যায় হবে।

শোভনার মনের তিক্ততাটা তখনও কাটে নি। তবু দুঃখী বৌ-এর এই কুণ্ঠা ও ব্যাকুলতায় সে লজ্জিতই বোধ করেছে, নিজের অনিচ্ছাতেও যেটুকু রূঢ়তা তার কণ্ঠে প্রকাশ পেয়েছে তার জন্যে। এই দুঃখী বৌ-এর সঙ্গে একদিন পরিচয় করতে পেরেই যে ধন্য হয়েছে, মুগ্ধ হয়েছে তার হৃদয়ের উদারতায়, একথা কয়েক মুহূর্তের জন্যে ভুলে যাওয়ার জন্যেও অপরাধী মনে হয়েছে নিজেকে।

যথাসাধ্য স্নিগ্ধ স্বরে সে বলেছে, কি সত্যি কথা না জানিয়ে যাওয়া তুমি অন্যায় মনে করছ জানি না, কিন্তু আমার কথা যদি বিশ্বাস কর তাহলে আমার স্বামীর সম্বন্ধে সত্য-মিথ্যা কোন কিছু জানবার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন আর আমার নেই।

শোভনার কণ্ঠের আন্তরিকতা কিন্তু দুঃখী বৌ-এর কাছে অভিমানের মতই শুনিয়েছে। ব্যাকুল ভাবে এক নিঃশ্বাসে সে বলে গেছে, ছি, এসব কি বলছ ভাই। তোমাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির কাঁটা আমার দোষেই বিঁধে থাকলে আমার আফসোসের সীমা থাকবে না। অনুপমবাবু আমাদের কাছে মিথ্যে কথা বলেছেন ঠিকই, কিন্তু তবু তাঁকে কত দুঃখে কি অবস্থায় এ মিথ্যে বলতে হয়েছে আমাদের চেয়ে তোমারই আগে বোঝা উচিত। তুমি আবার অসুখে পড়েছ বলে তোমায় হাসপাতালে পাঠাতে হয়েছে এই কথাই জানিয়ে তিনি যে-কোন একটা কাজ চাইতে এসেছিলেন। তখন তুমি এ কাজ পেয়েছ কি না জানি না। পেয়ে থাকলেও নিজের জন্যে ও মিথ্যেটুকু বলা খুব সাংঘাতিক অন্যায় বলে মনে করতে পারছি না।

কথাগুলো বলে এমন ভাবে দুঃখী বৌ শোভনার দিকে চেয়েছে যেন শোভনার মনের কাঁটাটুকু দূর হয়ে গেছে না জেনে গেলে তার স্বস্তি নেই।

শোভনা সেই রকম কিছু আশ্বাস দিয়েই এ অপ্রীতিকর আলোচনাটা শেষ করতে চেয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ তার মনের মধ্যে কি যেন একটা তিক্ত বিদ্রূপ-তীব্র খেয়ালের ঢেউ উঠেছে।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে সে একটু হেসে বলেছে, না, অন্যায় তিনি কিছু করেন নি। বরং আসল সত্যটা গোপন করে আমার মান বাঁচাবার যে চেষ্টা করেছেন তার জন্যেই আমার কৃতজ্ঞ থাকা বোধ হয় উচিত। আর কেউ না জানুক সত্য কথাটা তোমায় অন্ততঃ না জানিয়ে পারছি না। আমার অসুখের কথাটা মিথ্যে। আসল সত্য হল এই যে, সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে তাঁকে আমি ছেড়ে এসেছি। এই কথাটাই লজ্জায় ঘৃণায় বলতে না পেরে বোধ হয় হাসপাতালের মিথ্যেটা তাঁকে সাজাতে হয়েছে।

দুঃখী বৌ এ কথায় স্তম্ভিত হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ কথা বলবার পর তার প্রতিক্রিয়াটুকু দেখবার জন্যেও শোভনা আর সেখানে দাঁড়ায় নি।

তার ক'দিন বাদে অফিসের কাজের পর বিকেলে বাইরে বেরিয়ে নিখিলকে রাস্তায় অপেক্ষা করতে দেখেছিল।

শোভনার ঠিক মনে নেই। ওই কয়েকটা দিনের ঘটনা ও ভাবনাগুলো মনের মধ্যে বিন্দুমাত্র অস্পষ্ট না হলেও যেন কেমন জট পাকিয়ে গেছে।

অফিসের ছুটির পর জেনী-দিই নিজের গাড়ীতে তাকে বাসায় পৌঁছে দেন নিত্য নিয়মিত ভাবে। শোভনা দু-একবার নিষ্ফল আপত্তি জানিয়ে পরে নিরস্ত হয়েছে।

জেনী-দির সঙ্গে গাড়ীতে গিয়ে বসবার আগেই নিখিলকে দেখতে পায়।

সেদিন জেনী-দির সঙ্গে বাসায় ফেরা আর হয় নি।

জেনী-দি আগে কখনও নিখিলকে দেখেন নি। কি তিনি ভেবেছিলেন শোভনা তখন অন্ততঃ জানতে পারে নি।

নিখিলের অমন অপ্রত্যাশিত ভাবে তার জন্যে রাস্তায় অপেক্ষা করায় শোভনার পক্ষে বিস্মিত হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু কেন

বলা যায় না তা যেন সে হয় নি। কে জানে মনের অগোচরে এমনি একটি প্রত্যাশাই হয়ত তার ছিল।

নিখিলের সঙ্গে এ চাকরি পাবার কিছুদিন পর থেকেই দেখাশোনা বিশেষ হয় নি। না দেখা হওয়ার কারণ স্বেচ্ছায় পরস্পরকে এড়িয়ে চলা নয়। নিখিল কিছুদিনের জন্যে কোথায় যেন বাইরে গেছল মাকে সঙ্গে নিয়ে। যাবার আগে দেখা করে গেলেও কোথায় যাচ্ছে তা জানায় নি। কৌতূহল যতটাই থাক্ শোভনারও প্রশ্ন করতে কোথাও বেধেছে। কেন যে এ দ্বিধা হয়েছে নিজেকে প্রশ্ন করতেও সে সাহস করে নি।

তার পর এই প্রথম দেখা।

তার জন্যে অপেক্ষা করতে দেখে বিস্মিত হোক-না-হোক, জেনী-দি গাড়ী নিয়ে চলে যাবার পর নিখিলের ব্যবহারে সে অবাক হয়েছে সত্যিই।

প্রথম দেখার পর কথাবার্তা কিছু হবার আগেই নিখিল রাস্তার ওপারের একটা চলন্ত ট্যাক্সি ডেকেছে।

ট্যাক্সি! ট্যাক্সি কেন? শোভনা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা না করে পারে নি।

ট্যাক্সিটা তখন তাদের কাছের ফুটপাথে এসে দাঁড়াবার জন্যে অদূরে মুখ ঘোরাচ্ছে।

ট্যাক্সি কেন জিজ্ঞাসা করছেন? নিখিল হেসে বলেছে, চড়ে বেড়াবার জন্যে। হাওড়ার সেই রেস্তোরাঁয় যে ইচ্ছের কথা বলেছিলেন, তাও আপনার আপত্তি না থাকলে আজ মেটাতে পারি। লক্ষ্য করেছেন কি না জানি না যে আজ আপনাকে ত নয়ই, খানদানী কোন হোটেলে রেস্তোরাঁয় ঢুকলে বয়-খানসামারা আমার পোশাক দেখেও অন্ততঃ চোখ কপালে তুলবে না।

বাড়াবাড়ি কিছু না থাক নিখিলের সাজ-পোশাকের পরিবর্তন আজ চোখে পড়বার মত। শোভনা তা লক্ষ্যও করেছে।

একটু হেসে বলেছে, কিন্তু আমাকে ট্যাক্সি চড়িয়ে হোটেল রেস্তোর াঁয় খাওয়াবার জন্যেই কি এত তোড়জোড়! তাই জন্যেই কি অপেক্ষা করে দাঁড়িয়েছিলেন এখানে ?

তাই যদি মনে করেন প্রতিবাদ করব না। এখন দরকার শুধু আপনার সম্মতির। যদি আপত্তি থাকে ত বলুন সামান্য কিছু গুণগার দিয়ে ট্যাক্সিকে বিদায় করে দিই।

ট্যাক্সিটা তখন তাঁদের কাছেই এসে দাঁড়িয়েছে।

নিখিলের দিকে একবার অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে শোভনা নিজেই প্রথম ট্যাক্সির ভেতরে গিয়ে বসেছে। নিখিল এসে বসবার পর ড্রাইভারকে নির্দেশও দিয়েছে সে নিজেই।

নিখিল একটু অবাক্ হলেও হেসে জিজ্ঞাসা করেছে, হোটেল রেস্তোর াঁয় তাহলে যেতে চান না ?

না। জীবনটা কাব্য নয় জানি, মাত্রা বা মিল কোন কিছুর ধার সে ধারে না। তবু একটা অধ্যায় যেখানে সুরু হয়েছিল সেখানেই তা শেষ করা যায় কিনা দেখতে যাচ্ছি।

চমকে একটু যেন সভয়েই নিখিল এবার শোভনার দিকে চেয়েছিল। শোভনার এ কণ্ঠস্বর সে অন্ততঃ কখনও আগে শোনে নি।

তার পর সত্যিই সেইখানেই শোভনা নিখিলকে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছিল।

সেই এক বেঞ্চিতে, হতাশা-গভীর এক সন্ধ্যায় যেখান থেকে উঠে আসবার শক্তিটুকুও শোভনাকে জীবনের ভিত্তিমূল থেকে যেন সংগ্রহ করতে হয়েছিল।

কি কথা সেদিন তাদের মধ্যে হয়েছিল ?

কিছুই বুঝি নয়।

পাশাপাশি বসে গভীর নীরবতার ভেতর দিয়ে পরস্পরকে যেন তারা নতুন করে চিনেছিল।

অনেকক্ষণ বাদে, এপার-ওপারের অসংখ্য আলোর বিন্দুর কম্পিত রেখায় ছাড়া বিস্তীর্ণ নদীর স্রোত যখন অন্ধকারে মুছে গেছে, নিখিল তখন ধীরে ধীরে দ্বিধাভরে বলেছে, কেন আজ তোমার অপেক্ষায় এসে দাঁড়িয়েছিলাম তখন জিজ্ঞাসা করেছিলে। সে প্রশ্ন তখন এড়িয়ে গেছলাম, ভাল করে সবকিছু বলবার সুযোগের আশায়। এখন মনে হচ্ছে সে সুযোগের আর দরকার নেই। ভেবে এসেছিলাম অনেক কথাই তোমায় বলব, যুক্তি দিয়ে তর্ক করে নিজের বিশ্বাসের ব্যাকুলতা দিয়ে যেমন করে হোক আমার কথা তোমায় বোঝাবই। কিন্তু এখন গভীর ভাবে বুঝতে পারছি, যে কথা হৃদয়ের অতলে থাকে তা জানাবার রাস্তা ও নয়। এখানে আজ এই আবছা অন্ধকারে শুধু এই পাশাপাশি বসে থাকার সান্নিধ্যে আমাদের অন্তরের সেই গভীর ঢেউ যদি পরস্পরকে না দোলা দিয়ে থাকে তাহলে কথার ঝড় তুলেও কোন লাভ হবে না। কিছুই না বলে তাই শুধু ছুটো খবর তোমায় জানাই। অনেকদিন বাদে সত্যিই একটা ভাল কাজ আমি পেয়েছি। এখানে নয়, বাংলা দেশ থেকে অনেক দূরে, যেখানে এখানকার চেনা জগতের স্মৃতিও ইচ্ছে করলে মুছে ফেলা যায়।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে নিখিল গলার স্বর একটু হাল্কা করবার চেষ্টা করে আবার বলেছিল, এই চাকরির পাকা খবর নিতেই আমি গেছলাম। ফিরে এসেছি এখানকার সব পাট চুকিয়ে যাবার ছুতোয় কদিনের ছুটি নিয়ে। যাবার পথে মাকে কাশীতে রেখে এসেছি তাঁরই নিজের ইচ্ছায়। জীবনের শেষ কটা দিন তিনি সেইখানেই কাটাতে চান। ছেলের প্রতি তাঁর অন্ধ স্নেহ যত প্রবলই হোক, অগঙ্গার দেশে গিয়ে পরকাল খোয়াতে তিনি রাজী নন।

নিখিল আবার চুপ করে ছিল কিছুক্ষণ।

শোভনা এতক্ষণের মধ্যে নিখিলের দিকে একবার ফিরে পর্যন্ত তাকায় নি। নিখিলের কোন কথা সে শুনেছে কি না তাও তার নিশ্চল স্তব্ধতার মূর্তি দেখে বোঝা যায় নি।

সে-ই কিন্তু এবার প্রায় অস্পষ্ট কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছিল, কবে আপনি যাচ্ছেন ?

কবে যাচ্ছি ? শোভনার এই প্রশ্নটুকুই যেন নিখিলের গলার স্বর দীপ্ত উত্তেজিত করে তুলেছিল, যদি বলি যাবার তারিখ শুধু নয়, এমন কি যাওয়া-না-যাওয়া তোমার ওপরই নির্ভর করছে !

আমার ওপর ! শোভনার কণ্ঠে বিস্ময়ের চেয়ে বেদনার সুরই যেন বেশী স্পষ্ট।

হ্যাঁ, তোমার ওপর। ধর্ম-নীতি, মানুষের সমাজের বিধি-নিষেধ আইন সব আমি মানি শোভনা, কিন্তু সেই সঙ্গে এ বিশ্বাসও আমার যাবার নয় যে, জীবনকে এমন সত্যের পরীক্ষা কখনও কখনও দিতে হয়, কোন কেতাবী আইন যার মর্ম জানে না। মানুষের আইন যে মুক্তি তোমায় দিতে পারে তার ব্যবস্থা তুমি যদি চাও ত আমি করতে প্রস্তুত। কিন্তু জীবনের পরম বিচারক যদি কেউ থাকেন তাহলে তাঁর কাছে মুক্তির রায় যে তুমি পেয়ে গেছ তা তুমি জান। সেই রায়কেই মাথা পেতে নিয়ে মানুষের বিচারের সুদীর্ঘ জটিলতার জন্যে অপেক্ষা করার ধৈর্য সত্যিই আমার নেই। আর সাতদিন মাত্র সময় আমরা নিজেদের দেব। যেখানে যাচ্ছি সেখানকার দুটি রেলের টিকিট কাটা থাকবে। নিজের মনের ব্যাকুলতায় তোমায় যদি ভুল বুঝে থাকি, আমায় ক্ষমা করো। ট্রেনের একটা সীট তাহলে খালিই যাবে। নিয়তিকেও তার জন্যে দোষ দেব না। বরং জীবনে একবার যে স্বর্গমর্ত্য-টলান দোলা লেগেছে তার জন্যেই কৃতজ্ঞ থাকব।

এত কথার উত্তরে কিছুই বলে নি শোভনা, শুধু নীরবে হাতটা বাড়িয়ে নিখিলের হাতটা খুঁজে নিয়ে ধরে থেকেছে।

তার পরের দিনই জেনী-দি তাঁর কাছে এসে শোভনার থাকবার কথা তুলেছিলেন। কিন্তু তার আগে চমকে দিয়েছিলেন হঠাৎ দুঃখী বৌ-এর কথা জিজ্ঞাসা করে।

অফিসের ছুটির পর সেদিন জেনী-দি শোভনাকে তাঁর ফ্ল্যাটেই নিয়ে গেছলেন, রাত্রের খাওয়াটা সেখানেই সেরে যাওয়ার জন্যে।

জেনী-দির অনুরোধে হপ্তায় এমন দু'চারদিন শোভনাকে অফিসের ছুটির পর সেখানেই খেয়ে আসতে হয়।

রান্নার আয়োজন করতে করতে জেনী-দি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, লটীর সঙ্গে তোমার কোথায় আলাপ হয়েছিল ?

লটী ! শোভনা অবাক্ হয়ে জেনী-দির দিকে তাকিয়েছিল।

জেনী-দি সেদিনকার শো-রুমের সাক্ষাৎটা উল্লেখ করবার পর শোভনা সবিস্ময়ে বলেছিল, ওর নাম লটী ! সত্যি কথা বলতে গেলে ওর আসল নামই জানতাম না। আমরা ওকে দুঃখী বৌ বলেই জেনে এসেছি।

দুঃখী বৌ ! এ নাম কোথা থেকে কে দিলে !

জেনী-দির গলায় বিস্ময়ের চেয়ে বেদনাই যেন ফুটে উঠেছিল।

কে কবে এ নাম দিয়েছিল তাও জানি না। তবে এক ছেলেমেয়ের অভাব ছাড়া কোন দুঃখ যার আছে বলে মনে হয় নি তার অমন উল্টো নাম কেমন করে হল সত্যিই ভেবে একটু অবাকই হয়েছি তখন।

জেনী-দি কিছুক্ষণ কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেছেন। তারপর গাঢ় স্বরে ধীরে ধীরে বলেছেন, উল্টো নয়, এর চেয়ে যথার্থ নাম ওর বুঝি হতে পারে না। তবে ওই নামের পেছনে কি করুণ ইতিহাস, আর কি অসামান্য মহিমা যে আছে তা যদি কেউ জানত !

সত্যিই বুঝতে পারলাম না আপনার কথা ! শোভনা কৌতূহলভরে না বলে পারে নি।

না পারবারই কথা,—জেনীদি একটু চুপ করে থেকে কি যেন একটা দ্বিধা জয় করে বলেছেন, লটী বয়সে আমার চেয়ে ছোটই হবে, তবে একই কনভেণ্টে আমরা পড়েছি। আসল নাম, বোধ হয় ওর লতিকাই ছিল, সে যুগের সাহেবিয়ানার ফ্যাশানে সে নাম হয়ে উঠেছিল 'লটী'। ওর স্বামী অরুণবাবুকে ত দেখেছ। কলেজ থেকে

বেরুবার পরেই ভালবেসে ও নিজের সমাজের বাইরে বিয়ে করে। বিয়ের উৎসবে আমরা সবাই বোধ হয় একই কথা ভেবেছিলাম। সামাজিক পরিবেশের তফাৎ থাকলেও এমন রাজযোটক আর হয় না বলেই আমাদের মনে হয়েছিল। কিন্তু সে রাজযোটকের এই পরিণাম কেউ কল্পনাও করতে পারে নি। বিয়ের কিছুদিন পরেই লটী জানতে পেরেছিল কোনদিন সন্তানের জননী হবার সৌভাগ্য তার হবার নয়।

জেনী-দি এইটুকু বলে থেমেছিলেন।

শোভনা প্রশ্ন আর কিছু করে নি, কিন্তু তার বিমূঢ় দৃষ্টিতে বোঝা গেছল, লটী বা দুঃখী বৌ-এর এই নাতি-বিরল দুর্ভাগ্যের মধ্যে নিদারুণ ইতিহাস বা অসামান্য মহিমার কোন পরিচয় সে পায় নি।

স্তম্ভিত হয়েছিল কিন্তু জেনী-দির পরের কথায়।

জেনী-দি বলেছিলেন, সাধারণ মাপের আর কোন স্বামী কি করত জানি না কিন্তু লটীর স্বামী নিজে থেকে লটীকে বিনা বাধায় সমস্ত লজ্জা স্বীকার করে বিবাহ বিচ্ছেদের সুযোগ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু লটীই অটল হয়ে থেকেছে তার সঙ্কল্পে।

শোভনাকে ব্যাপারটা ভাল করে বোঝবার একটু সময় দেবার জন্যেই যেন কিছুক্ষণ থেকে জেনী-দি আবার বলেছিলেন, এ সব কথা আমি কি করে জানলাম ভাবতে পার। সত্যিই আমার জানবার কথা নয়। কিন্তু আমার স্বামী ব্যারিষ্টার ছিলেন, বোধ হয় তোমায় বলেছি। অরুণবাবু তাঁর কাছেই এসেছিলেন পরামর্শ ও সাহায্য নিতে। আমার স্বামী এমন রসাল বিচিত্র ব্যাপারটা সবিস্তারে আমায় না শুনিয়ে পারেন নি। লটীর সঙ্কল্পের অটলতায় অন্ধ সংস্কারের দুর্বলতাই তিনি দেখেছিলেন। আমার মন কিন্তু তাতে সায় দেয় নি।

জেনী-দি সেদিন আরো অনেক কথাই বলেছিলেন। বলেছিলেন, লটীর জীবনের এ গোপন করুণ রহস্য কেন যে তোমায় না বলে পারলাম না নিজেই ঠিক ভেবে পাচ্ছি না। হয়ত নিজের মনে আজ জীবনের অনেক কিছু সম্বন্ধে নতুন করে সংশয়ের যন্ত্রণা জেগেছে

বলে। লটীর কথা ভাবলে শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে আমি অভিভূত হই আজো। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে হয় তার জীবনের আদর্শ বুঝি শুধু কাব্যে কাহিনীতেই অমর করে রাখবার। সে আদর্শকে দূর থেকে কল্পনায় প্রণাম করাই ভাল। নইলে জীবনকে বঞ্চনা করবার তার কোন সঙ্গত দাবীকে অস্বীকার করবার শাস্তি অসহ্য।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর শোভনাকে তার বাসায় পৌঁছে দেবার সময়েই জেনী-দি শোভনাকে তাঁর ফ্ল্যাটে এসে থাকবার কথা বলেছিলেন। তাঁর মনের সুর তখন আবার বদলে গেছে।

ঠাট্টার সুরেই বলেছিলেন, তোমার নিয়তি ত আমার ছকেই বাঁধা দেখতে পাচ্ছি। কেন আর তবে আলাদা এমন পড়ে থাকা। আমার কাছেই এসে থাক না কেন? মাঝে মাঝে একটু-আধটু হা-হুতাশ শোনাবার মানুষ না পেলে আমারও যে আর চলছে না।

নিখিলের সঙ্গে দেখা হয়েছে তার আগের দিনই। তার শেষ কথাগুলোই সারাক্ষণ তখন মনের মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছে। সমস্ত সময়ের স্রোত যেন সামনের একটা তারিখের অজানা অনিশ্চিত প্রপাতের দিকে ধাবিত।

শোভনা দ্বিধাভরে সময় চেয়েছিল ক'দিন ভেবে দেখবার।

জেনী-দিকে ঠিক আগের দিনই কথাটা জানিয়েছিল।

অন্য কিছু নয়, শুধু এ চাকরি সে আর করবে না সেই সিদ্ধান্তের কথা।

ভাবনা ছিল, জেনী-দি এ সম্বন্ধে কারণ নিশ্চয়ই জানতে চাইবেন। যত অস্বস্তিকরই হোক জেনী-দি সে রকম কোন প্রশ্ন করলে সব কথাই না বলে সে পারত না। বলবার জন্যে নিজেকে সে প্রস্তুতও করেছিল। স্থির করেছিল, অন্ততঃ এই একজনের কাছে কোন কথাই সে গোপন করবে না।

কিন্তু জেনী-দি কোন প্রশ্ন করেন নি। এমন কি তেমন কোন বিস্ময়ের আভাসও দেখা যায় নি তাঁর মুখে।

শুধু কেমন একটু সস্নেহ কৌতুকের দৃষ্টিতে তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে গাঢ় স্নিগ্ধস্বরে বলেছিলেন, ভুল করছ যদি ভাবি তবু সাবধান হবার উপদেশ দেব না। ভুল করার ভয়েই জীবনকে সবচেয়ে বড় ফাঁকি আমরা দিই।

তার পর সেই আশা আকাঙ্ক্ষা উত্তেজনা স্পন্দিত রাত।

সন্ধ্যার পর একটু দেরি করেই শোভনা বাসায় ফিরেছিল। ফিরেছিল বেশ একটু ক্লান্ত হয়ে। সারা দুপুর থেকে বিকেলটা দোকানে-বাজারে ঘুরে কয়েকটা দরকারী-অদরকারী জিনিসপত্র কিনেছে। ঘোরাঘুরি করেছে যতখানি দরকার তার চেয়ে বুঝি অনেক বেশী। এই কেনাকাটায় নিজেকে ব্যস্ত রাখাও যেন তার এক-রকম প্রস্তুতি।

এ কদিনের মধ্যে নিখিলের সঙ্গে একটিবারের জন্যে মাত্র দেখা হয়েছে। নিখিল এ বাসা তার মাকে নিয়ে চলে যাবার সময়েই ছেড়ে গেছল। সাময়িক ভাবে একটা হোটেলেই এসে উঠেছে।

সেখান থেকে একটিবার শুধু সকালে একদিন এসেছিল শোভনার অফিসে বার হবার আগে।

এসে ঘরে পর্যন্ত ঢোকে নি, দরজাতেই দাঁড়িয়ে শুধু কটি কথা মাত্র বলে চলে গেছে। বলে গেছে—সকালেই ট্রেন, একটু আগেই ট্যাক্সি নিয়ে আমি আসব। একলাই আমায় ফিরতে হবে কি না তা স্থির করার ভার তোমার ওপরই ছেড়ে গেলাম।

শোভনা রাত্রের খাওয়াটা সেদিন বাইরেই সেরে এসেছিল। একবার ইচ্ছে হয়েছিল জেনী-দির সঙ্গে শেষ দেখা করে আসতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা যায় নি।

বাসায় ফিরে জিনিসপত্র গোছাতে বেশ একটু সময় লেগেছে। তার পর শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তিতে একান্ত অবসন্ন হলেও

বিছানায় শুয়ে ভাল করে ঘুমোতে পারে নি। একটা অগভীর তন্দ্রায় মাঝে মাঝে একটু আচ্ছন্ন হয়েছে মাত্র।

এই আচ্ছন্নতা হঠাৎ চমকে কেটে গেছে।

দরজায় কে যেন ধীরে ধীরে ঘা দিচ্ছে।

এত রাত্রে তার দরজায় কে ঘা দিতে পারে!

নিখিলের ছেড়ে-যাওয়া বাসায় নতুন একজন ভাড়াটে এসেছে বটে। কিন্তু তাদের সঙ্গে ত পরিচয়ই নেই। মধু এখন আশুবাবুর ঘরেই থাকে। কিন্তু সেও এত রাত্রে এমন দ্বিধাভরে দরজায় ঘা দেবে কেন?

উঠে বসেও শোভনা প্রথম কোন সাড়া দেয় নি। দরজায় মৃদু করাঘাত শোনা গেছে আবার।

কে? বেশ তীক্ষ্ণস্বরেই জিজ্ঞাসা করেছে শোভনা।

দরজার ওধার থেকে অনুচ্চ কুণ্ঠিত মিনতি শোনা গেছে এবার।

দরজাটা একটু খোল সু।

শোভনার সমস্ত শরীর হিম হয়ে গেছে যেন তখনি, ভয়ে বিস্ময়ে না কাতরতায়, তা সে নিজেই জানে না।

প্রায় যন্ত্রচালিতের মত খাট থেকে নেমে দরজাটা খুলে দেবার পর শুধু একটা কথাই তার গলা দিয়ে বেরিয়েছে।

তুমি?

অস্পষ্ট রুদ্ধস্বর, তবু তা যেন তার সমস্ত দেহমন জীবন মথিত করা আর্তনাদের মত।

আমায় মাপ করো সু। তোমার কাছে না এসে আমার উপায় ছিল না।

শোভনা কিছুই বলে নি কথার উত্তরে, ধীরে ধীরে আবার ঘরের ভেতর গিয়ে বসেছে। অনুপমও এসেছে তার পিছু পিছু। কাছে গিয়ে বসে নি, দাঁড়িয়ে থেকেই বলেছে, আমায় একটু জল দেবে সু?

অন্ধকার ঘর, শোভনা তবু আলো জ্বালে নি, অন্ধকারেই কলসি থেকে জল গড়িয়ে গেলাসটা অনুপমের হাতে দিয়েছে।

অনেকক্ষণ লেগেছে অনুপমের জলটুকু খেতে। সে জল যেন তার গলা দিয়ে নামতে চাইছে না।

জল খাওয়া শেষ হবার পরও সে নীরবে দাঁড়িয়ে থেকেছে অনেকক্ষণ। তার পরে প্রায় অস্ফুটকণ্ঠে বলেছে, আমায় কিছু টাকা দিতে হবে সু। নিরুপায় হয়ে শেষ পর্যন্ত তোমার কাছে এসেছি। তুমি আজকাল ভাল চাকরি কর। যত সামান্যই হোক কিছু আমায় দাও। বাচ্চাটাকে নইলে বাঁচাতে পারব না।

অনেক কথাই নিশ্চয় বলতে পারত শোভনা। বলতে পারত— কেন? আমায় হাসপাতালে পাঠাবার নাম করে তুমিও ত ভাল চাকরিই পেয়েছ, তবু তোমার আমার কাছেই কি বাচ্চাকে বাঁচাবার টাকা চাইতে আসতে হয়?

কিন্তু কিছুই সে বলে নি, বালিশের তলাতেই তার ব্যাগটা থাকে, সেটা খুঁজে নিয়ে খুলে অন্ধকারেই অনুপমের হাতে নোটগুলো দিয়েছে।

সত্যিই বিমূঢ় হয়ে গেছে অনুপম, নোটগুলো হাতের মুঠোয় ধরে কেমন একটু শঙ্কিতস্বরেই বলেছে, এ যে অনেক টাকা সু!

হ্যাঁ, যা আমার কাছে আছে সবই তোমাকে দিলাম। আশা করি বাচ্চা তোমার বাঁচবে।

সু! একটা মূর্ত কান্নাই যেন মেঝের ওপর ভেঙে পড়ে শোভনার কোলের মধ্যে মুখ গুঁজেছে প্রচণ্ড ব্যাকুলতায়।

নিখিল বক্সী তার পর দিন খুব সকালেই এসেছিল।

এসে কয়েক মুহূর্ত শুধু দরজার কাছে দাঁড়িয়ে নীরবেই ফিরে গেছল আবার।

শোভনার ঘরের দরজা খোলাই ছিল, শোভনা নয়, নিস্তব্ধ

কোন পাষাণমূর্তিই যেন সেখানে দাঁড়িয়ে, আর তার পেছনে বিছানার ওপর তখনো নিদ্রিত যে মানুষটিকে দেখা গেছল কোনদিন তাকে না দেখলেও নিখিল চিনতে ভুল করে নি।

ফিরে যাবার আগে এক মুহূর্তের জন্যেও পরস্পরের দৃষ্টি বিনিময় কি তাদের হয় নি?

হয়ে থাকলেও তা বুঝি সমস্ত ব্যাখ্যার বাইরে।

অন্ধকার শূন্যতার সঙ্গে নেভানো দীপের সাক্ষাৎ কি ভাষা দিয়ে বোঝাবার!

সমাপ্ত